সাহিত্য সঞ্চয়ন

বাংলা (প্রথম ভাষা)

দশম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

দশম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য সঞ্চয়নের পাশাপাশি দ্রুত পঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ এবং নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পী—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। এবার দশম শ্রেণির নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হলো।

দশম শ্রেণির বাংলা প্রথম ভাষার বইয়ের নাম 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'। পূর্বতন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। সাতটি পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার অগ্রগণ্য সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে ভারতীয় সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য। 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইয়ের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলা সাহিত্যের বহুবর্ণ, বহুবিচিত্র সম্ভারকে পরিবেশন করতে চেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির মাধ্যমে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর অনুরাগ তৈরি হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সঙ্গে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নির্মিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়া আবশ্যক। পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ দ্রুতপঠন বা সহায়ক পুস্তক হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বইটিকে রঙে-রেখায় অনুপম সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান

'বিশেষজ্ঞ কমিটি'

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল

বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা

ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

[*] চিহ্নিত পাঠগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

শাবলতলার মাঠ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন পরে শাবলতলার মাঠ দেখলাম সেদিন। আমার পিসিমার বাড়ির দেশে। ছেলেবেলায় যখন পিসিমার বাড়ি থেকে দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় পড়তাম সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। পিসিমা মারা যাওয়াতে সে গ্রামে আর যাইনি কখনও।

সেদিন আবার কার্যোপলক্ষে গোরুর গাড়ি চড়ে যেতে যেতে শাবলতলার মাঠ চোখে পড়ল, কিন্তু মস্ত বড়ো কী এক কারখানা হচ্ছে সেখানে। রেল লাইন বসেছে মাঠের ওপর দিয়ে — বড়ো রেল লাইন। কত যে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে! লোকজন কুলিমজুরের ভিড়, দুমদাম শব্দ, সে কী বিরাট ব্যাপার।

চালাঘর ও তাঁবু চারিধারে। ইন্‌জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের দল খেটে খেটে সারা হলো। পাঞ্জাবি কন্ট্রাক্টরের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের খুঁটি বসানো হচ্ছে, ইলেকট্রিকের ও টেলিফোনের তার খাটানো হবে। ইটবোঝাই কাঠ-বোঝাই লরির ভিড় নতুন তৈরি চওড়া রাস্তাগুলোর ওপরে। চুনের ধুলো, সিমেন্টের ধুলো উড়ছে বাতাসে।

এ কী হলো?

আমার সেই ছেলেবেলাকার শাবলতলার মাঠ কোথায় গেল? সত্যিই তা নেই। তার বদলে আছে কতকগুলো তাঁবুর সারি, ইটখোলা, পাথুরে কয়লার স্তূপ, চুনের ঢিবি, কাঠের ঢিবি, লোকজনের হৈ চৈ, লরির ভিড়।

আজ সকালে মার্টিন লাইনের ছোটো স্টেশনে নেমেছি, গোরুরগাড়ি করে চলেছি পিসিমার বাড়ির গ্রামের পাশের একটা গ্রামে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে। রাস্তার ধারে পড়ে শাবলতলার মাঠ। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা তার।

গোরুরগাড়ির গাড়োয়ানকে বলি — হ্যাঁরে, এটা শাবলতলার মাঠ, না?

— হ্যাঁ বাবু।

— কী হচ্ছে এখানে?

— কী জানি বাবু, কলকারখানা বসছে বোধ হয়।

— কতদূর নিয়ে?

— তা বাবু অনেক দূর নিয়ে — উই বাজিতপুর, মনসাতলা, ছাওয়াল-মারি, বেদে-পোতা, হাঁসখালির চড়া পর্যন্ত।

— গ্রামগুলো সব কোথায়?

— সব উঠিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল আমার এগারো বছর বয়সের একটি মধ্যাহ্নদিন। আর মনে পড়ল দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে।

উমাচরণ মাস্টার কতদিন থেকে দুর্গাপুর ইউ পি পাঠশালার হেডমাস্টারি করছিলেন তা আমি বলতে পারব না। গ্রামের রায় জমিদারদের ভাঙা কার্নিসে পায়রার বাসাওলা বৈঠকখানার একপাশে সেকেলে তক্তপোশে ছিল তাঁর বাসা। দেয়ালে তাঁর হুঁকো ঝুলত পেরেকের গায়ে, বাঁশের আলনায় তাঁর দুখানা আধময়লা ধুতি ও এক এবং অদ্বিতীয় পিরানটি আলতো করে ঝোলানো থাকত — আর থাকত তক্তপোশের নীচে একজোড়া কাঠের খড়ম। একটা টিনের বিবর্ণ তোরঙ্গ। একটা চটের-থলে-ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। একখানা পাকা বাঁশের লাঠি এবং—সেইটেই বেশি করে মনে আছে—একগাছা তেলে-জলে পাকানো বেত।

উমাচরণ মাস্টার আবার বই লিখতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক, লেখক বা সাহিত্যিকের যশোগৌরব সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন অস্পষ্ট—তবুও মাস্টারমশায় যখন ক্লাসের টেবিলের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে তাঁর লেখা 'আক্কেল গুড়ুম' বই পড়তেন—তখন আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘগুম্ফযুক্ত বসন্তের দাগ-আঁকা প্রৌঢ় মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

হ্যাঁ—তাঁর বই-এর নাম ছিল 'আক্কেল গুড়ুম'—তিনি বলতেন 'প্রহসন'। আমার যা বয়স তখন তাতে 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'প্রহসন' দুটো কথার একটারও মানে বুঝতাম না। মনে আছে বই-এর মধ্যে একটি ইংরেজি পড়া ছোকরার কথা আছে এবং পড়ার ভঙ্গিতে মনে হতো উক্ত ইংরেজি-পড়া ছোকরা খুব ভালো লোক নয়।

উমাচরণ মাস্টার আমাদের দিকে চেয়ে সগর্বে বলতেন — এই বই পড়ে গোবরডাঙার সেজোবাবুর শালা

কী বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, উমাচরণবাবু, আপনি কালে গিরিশ ঘোষের সমান লেখক হবেন। — বুঝলে?

আমি বলেছিলাম — গিরিশ ঘোষ কে পণ্ডিত মশাই?

উমাচরণবাবু অনুকম্পার হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন — গিরিশ ঘোষ? জান না? হুঁঃ! কী-বা জান?

আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। কী উত্তর দেবো? যখন সত্যই জানি নে গিরিশ ঘোষ কে, নামও কোনোদিন শুনিনি! উমাচরণ তাঁর এই মূল্যবান প্রহসন আমাদের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি অনেক করেছিলেনও। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ি একখানা বা দুখানা করে 'আক্কেল গুড়ুম' ছিলই। মাইনের টাকা দিলে খুচরো ফেরত দেওয়ার রীতি ছিল না তাঁর। বলতেন — কত বাকি? সাত আনা? নাও একখানা ভালো বই নিয়ে যাও। বাড়ি গিয়ে পড়তে দিয়ো সবাইকে।

একদিন পিসিমা বললেন — হ্যাঁরে, মাইনের টাকা দিলাম, ন আনা পয়সা ফেরত দিলি নে?

— না পিসিমা। মাস্টারমশাই বই একখানা দিয়েছেন তার বদলে।

— কী বই?

— আক্কেল গুড়ুম।

— ওমা, সে আবার কী বই? তুই কী বলে সেই বই আনতে গেলি? যেমন পোড়ারমুখো মাস্টার তেমনই পোড়ারমুখো ছেলে! বই-এর নাম শোন না — 'আক্কেল গুড়ুম'। কেষ্টর শতনাম পাওয়া যায় তো একখানা আন গে বরং — ও বই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

— সে হবে না পিসিমা, তিনি ওসব বাজে বই লেখেন না। এ হলো প্রহসন।

— সে আবার কী রে?

— সে তুমি বুঝবে না? গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ?

— সে কে আবার? আমাদের গাঁয়ে তো ও নামের কেউ নেই। দুগ্‌গোপুরের লোক নাকি?

— সে তুমি বুঝবে না। তিনি আমাদের মাস্টারমশায়ের মতো প্রহসন বই লেখেন।

পিসিমা ধমক দিয়ে বলতেন — তুই চুপ কর বাপু — বড্ড পণ্ডিত হয়েছিস তুই! আমি জানি নে — ওঁর গাল টিপলে দুধ বেরোয় উনি জানেন — ফাজিল কোথাকার! ওসব গিরিশ ঘোষ সতীশ ঘোষ বুঝি নে — কাল ও বই ফেরত দিয়ে কেষ্টর শতনাম আনতে পারিস ভালো, নয়তো ন আনা ফেরত আনবি — যা —

একদিন উমাচরণ মাস্টার মশায় আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, বড়ো বড়ো লেখকরা সবাই প্রথম জীবনে তাঁর মতো ইস্কুল-মাস্টারি করেছিলেন। কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের ক্লাসের সারদা হঠাৎ বলে বসল — আপনার বয়স কত মাস্টারমশাই?

— কেন রে?

— তাই বলছি।

উমাচরণ মাস্টার তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটার খটকা

বাধছে কোথায়। এই বয়সেও যদি এখন উমাচরণ মাস্টার আমাদের এই স্কুলে মাস্টারি করতে রয়ে গেলেন, তবে কোন বয়সে গিয়ে তিনি কোথায় কী বড়ো কাজ করবেন? আমাদের ক্লাসের সতু কিন্তু বলত — মাস্টার মশাই খুব বড়ো পণ্ডিত। ওরকম হয় না।

আমি বললাম — কেন রে?

— উনি চালতেবাগানের মাঠের ধারে বসে রোজ কী করেন! বোধ হয় লেখেন। কবিমানুষ কিনা।

আমি একদিন সতুর সঙ্গে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। চালতেবাগান বহুকালের প্রাচীন আম তেঁতুল গাছের ছায়ায় দিনমানেই সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। অনেক রকম মোটা লতা গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে। বাগান পার হয়েই একটা ছোটো মাঠ, উমাচরণ মাস্টার সে মাঠের ধারে বসে আছেন, বাগানের ছায়ার আশ্রয়ে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে। মাদুরের ওপর কাগজ বই ছড়ানো। পাছে উড়ে যায় বলে মাটির ছোটো ছোটো ঢেলা চাপানো সেগুলোর ওপর। আমরা শ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, তিনি কখনও উপুড় হয়ে কী লিখছেন, কখনও সামনের মাঠের দিকে চেয়ে কী ভাবছেন, কখনও আপনমনে হাসছেন, বিড় বিড় করে কী বকছেন।

সতু সসম্ভ্রমে চুপি চুপি বললে — দেখলি? কবিমানুষ!

আমি বললাম — কী করছেন?

— লিখছেন।

— বিড় বিড় করে কী বকছেন?

— ও রকম কবিরা করে থাকে।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে কবির কাণ্ড অনেকক্ষণ দেখলাম। এই আমার জীবনে প্রথম একজন জীবন্ত কবির ক্রিয়াকলাপ দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটল। মনে আছে, শ্যাওড়া ঝোপের পাশেই ছিল বড়ো একটা কতবেল গাছ, তলা বিছিয়ে পড়ে ছিল পাকা পাকা কতবেল। সেই বয়সের লোভ, বিশেষ করে কতবেলের ওপর লোভ দমন করেছিলাম। কবি দেখবার আনন্দে ও বিস্ময়ে। উমাচরণ মাস্টারের বয়স তখন কত? আমার মনে হয় চল্লিশের ওপর। কারণ আমার মায়ের বড়ো ভাই, আমার বড়ো মামা — যাঁর বয়স তখন শুনতাম পঁয়ত্রিশ — তিনি মাস্টারমশায়কে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

আমরা যেমন নিঃশব্দে সেখানে গিয়েছিলাম তেমনই নিঃশব্দে চলে এলাম মনে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে।

এর পরে উমাচরণ মাস্টার যখন পড়াতেন, তখন হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতাম। একজন কবি বটে! উনি ঠিকই বলেছেন — বড়ো বড়ো লোকেরা প্রথম জীবনে মাস্টারি করে। ওঁর বয়স বেশি হয়েছে বটে কিন্তু উনি একজন কবিও তো হয়েছেন। সারদাটা কিছুই বোঝে না।

বছরখানেক কাটল। আমরা কটি ছেলে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হয়েছি। সেই বছর উমাচরণ মাস্টার আমাদের নিয়ে রানাঘাটে যাবেন পরীক্ষা দেওয়াতে। চারটি ছেলে — মনে আছে চক্কত্তিদের কানাই, আমি, সতু ও সারদা। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে বেরিয়ে শাবলতলার মাঠে যখন পড়েছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

বড্ড মনে আছে সেই অপরাহ্ণের কথাটি। তখন শাবলতলার মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মস্ত বড়ো মাঠের এখানে ওখানে কুলগাছ শ্যাওড়া-ডাঁটা আর বনতুলসীর জঙ্গল। ধু ধু করছে মাঠ যেন সমুদ্রের মতো, কূলকিনারা নেই কোনো দিকে। এত বড়ো মাঠ কখনও দেখিনি। দুর্গাপুর থেকে শাবলতলার মাঠ প্রায় দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ

পথ। কাছাকাছি কোনো গ্রাম নেই এ মাঠের কোনো দিকে। একটা সরু মেঠো পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কী একটা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে দুপুরের রোদে। আমরা সবাই ছেলেমানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। উমাচরণ মাস্টার বললেন — যাও সব গাছতলায় একটু বসে নাও।

আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঁচকা। তার মধ্যে আমাদের বই-দপ্তর আছে, কাপড় গামছা ও কাঁথা আছে। থাকতে হবে নাকি হোটেলে। আমরা বোঁচকা নামিয়ে একটা কুলগাছের তলায় সবাই বসলাম। মাস্টারমশায় বললেন — দেখো তো কুল হয়েছে কিনা।

সতু দেখে বললে — কুল হয়েছে, ছোটো ছোটো — খাওয়া যায় না।

কানাই-এর মা ওকে সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে নারকেলের নাড়ু আর রুটি করে দিয়েছিলেন পুঁটুলিতে। সতু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলে। আমি চাইতে গেলাম, কানাই বললে, নেই।

আমরা একটু পরে সবাই বোঁচকা রেখে হুটোপাটি করে মাঠের মধ্যে বনতুলসীর জঙ্গলে খেলা করতে লাগলুম। কী সুন্দর যে লাগছিল। ক্ষুদ্র গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খেলা করে বেড়াই, এত বড়ো মাঠের এত ফাঁকা জায়গায় খেলা করবার সুযোগ কখনও পাইনি। ওদের কেমন লাগছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো নতুন রাজ্যে রূপকথার জগতে এসে পড়েছি — তুলসীমঞ্জরীর সুগন্ধভরা অপরাহ্ণের বাতাসে যেন কোন সুদূরের ইঙ্গিত। যে দেশ কখনও দেখিনি, তার কথা কিন্তু আমার মনে সর্বদাই উঁকি দেয়, আজ এই শাবলতলার মাঠে এসে সেই দূর-দূরান্তকে দেখতে পেলাম। ঝোপে ঝোপে শালিক আর ছাতারে পাখির কলরব, এখানে ওখানে বেলে জমিতে খেঁকশেয়ালের গর্ত, রাঙা কেলেকোঁড়া ফুলের লতা জড়িয়ে উঠেছে বুনো কলুচটকা আর তিত্তিরাজ গাছে, জনমানুষের বাস নেই, একটা কলা গাছ কি আম গাছ চোখে পড়ে না, যেন এ জগতে মানুষের বাস নেই, শুধুই বনঝোপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করে পাতার ধুলো উড়িয়ে এ দেশে চলে যাও, লেখাপড়ার বিরক্তিকর বাধ্যতা এখানে নেই। খেলা ছেড়ে লেখাপড়া করতে কেউ বলবে না এ দেশে। উমাচরণ মাস্টার সেই পুরোনো, একঘেয়ে, বালকের পক্ষে মহা বিরক্তিকর জগতের মানুষ, এ নতুন জীবনের উদাস মুক্তির মধ্যে, দিনরাতব্যাপী খেলা আর অবকাশের মধ্যে ওঁর স্থান নেই আদৌ।

বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সতু বললে — হ্যাঁরে, মাস্টারমশাই কোথায় রে?

আমি বললাম — কেন, কুলতলায় নেই?

— কতক্ষণ তো তাঁকে দেখছি নে। গেলেন কোথায়? আমাদের যেতে হবে না ইস্টিশনে? দু ঘণ্টার ওপর তো এখানে আছি। গাড়ি ধরতে হবে না?

আমার মনে হচ্ছিল গাড়ি ধরে আর কি রাজা হব আমরা! এই তো বেশ আছি, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে না-ই বা গেলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর এসে সেবার স্কুলে বলে গিয়েছিল রানাঘাটে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় নাকি নানা গোলমাল। খাতায় লিখে পরীক্ষা হয়, গার্ড আছে সেখানে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে, একটু যে দেখাদেখি করবে কী বলাবলি করবে তার কোনো উপায় নেই। বলাবলি করলেই মহকুমার হাকিমের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে, তিনি জেলও দিতে পারেন, জরিমানাও করতে পারেন। একটু ফিসফাস করবার জো নেই সেখানে। নবমীর পাঁটার মতো কাঁপতে কাঁপতে ঢুকতে হবে হলঘরে। কী ভীষণ পরিণাম ছাত্রজীবনের!

সত্যি বলছি, শাবলতলার মাঠ দেখবার পরে, এখানে এসে এই দু ঘণ্টা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর পরে

আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই রকম বিশাল মুক্ত বনময় ধূলিভরা মাঠের অবাধ শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যে খেলা করে বেড়ানো। পরীক্ষা দিয়ে কী হবে! কানাই এসেও বললে — আমরা যাব কখন? মাস্টারমশাই কোথায়?

সত্যিই তো, তাঁকে কোনো দিকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই মিলে খুঁজতে বার হওয়া গেল। সতু ডাকতে লাগল — ও মাস্টারমশাই, মাস্টার ম-শা-ই—

কোনো সাড়া নেই।

সতু ভীতুমুখে বলল — বাঘে নিয়ে গেল নাকি রে?

কানাই বললে — দূর, এখানে মানুষ-খেকো বাঘ থাকবে?

— না, নেই! তোকে বলেছে!

— তবে গেলেন কোথায়?

আমি বললাম — তোমরা খুঁজে দেখো। আমি এখানে খেলা করি।

এমন সময় সারদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল — শীগগির — শীগগির আয় — দেখে যা —

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠেলাম — কী হয়েছে রে? বেঁচে আছেন তো?

কথা বলতে বলতেই আমরা সারদার পেছনে ছুটলাম। বেশ খানিকটা দূর দৌড়ে সারদা থেমে পড়ল এবং আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে আমাদের চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

একটা শুকনো খাল-মতো নীচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড় বিড় করে আপনমনে কী বলছেন, এমন কী আপনমনে ফিক ফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল। অমন তন্ময় হয়ে লিখতে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি, অমন ভাবে আপনমনে হাসতেও তাঁকে কখনও দেখিনি।

সতু মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললেন — মাস্টারমশাই একজন আসল কবি।

সারদা ওর মতে মত দিয়ে বললেন — ঠিক তাই।

কানাই ও আমি কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে এই সত্যিকার জীবন্ত কবিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের কত ভাগ্যি যে আমরা এমন মাস্টার পেয়েছি।

কানাই একটু পরে বললে — কিন্তু ভাই, সন্ধে হলো। ওঁকে না ডাকলে আমাদের উপায় কী হবে? ডাকি ওঁকে! কী বলিস?

কেউ সাহস করে না।

সারদার মনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা একটু ফিকে, সে দু-একবার আমাদের উপস্থিতি-জ্ঞাপক কাশির আওয়াজ করলে।

সতু চুপি চুপি বললে — এই! আস্তে!

সারদা বললে — হ্যাঁ, আস্তে বই কী! আমরা মরি এখন এই মাঠের মধ্যে সন্ধেবেলা! বাঘে ধরুক সবসুদ্ধ — বলে সজোরে একবার কাশির আওয়াজ করতেই উমাচরণ মাস্টার চমকে পেছন ফিরে চাইলেন।

সারদা বললে — আসুন মাস্টারমশাই, সন্ধের দেরি নেই যে — ইস্টিশান এখনও অনেকখানি রাস্তা —

উমাচরণ মাস্টার ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র গুটিয়ে বগলে করে নিয়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন শুকনো খাল থেকে। অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন — তাই তো, বেলা গিয়েছে দেখছি। চল চল!

তারপর পেছনদিকে চেয়ে বললেন — জায়গাটা বড়ো চমৎকার — না?

সতু সশ্রদ্ধ সুরে বললে — ওখানে কী করছিলেন মাস্টারমশাই? কী আছে ওখানে?

উমাচরণ মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন — সে কী তুই বুঝবি? সিনারি কাকে বলে জানিস? চমৎকার সিনারি ওখানটাতে। কবিতা লিখছিলাম। কী চমৎকার মাঠটা, বুঝিস কিছু?

আমারও চোখে যে এই অপরাহ্নে এই মাঠ অদ্ভুত ভালো লেগেছে, মাস্টারমশায়ের কথার মধ্যে তার সায় পেয়ে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি নতুন দৃষ্টি পেলাম সেই দিনটিতে, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে যাবার পথে। উমাচরণ মাস্টার কত বড়ো শিক্ষকের কাজ করলেন সেদিন — তিনি নিজেও কি তা বুঝলেন?

আমার কথা এখানেই শেষ। উমাচরণ মাস্টারের ইতিহাসও এখানেই শেষ। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা সেসব। উমাচরণ মাস্টার আজ আর বোধ হয় বেঁচে নেই। বড়ো হয়ে উমাচরণ চক্রবর্তী বলে কোনো কবির লেখা কোথাও পড়িনি বা কারও মুখে নামও শুনিনি। তাতে কিছু আসে যায় না। যশোভাগ্য সকলের কি থাকে!

আজ এতকাল পরে শাবলতলার মাঠে এসে আবার মনে পড়ে গেল বাল্যের সেই অপূর্ব অপরাহ্নের কথা, মনে পড়ে গেল উমাচরণ মাস্টারকে। দুঃখ হলো দেখে — সে শাবলতলার মাঠ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সে সৌন্দর্য, সে নির্জনতা। উমাচরণ মাস্টারের জন্যে মনটা এতদিন পরে যেন কেমন করে উঠল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ — ১৯৫০) : জন্মস্থান বনগ্রাম, চব্বিশ পরগনা। বাল্য ও কৈশোর দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের মধ্যে কেটেছিল। জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও বহুধা বিস্তৃত, শিক্ষাকতাও করেছেন দীর্ঘদিন। পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করত। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘উপেক্ষিতা’ গল্প দিয়ে তাঁর কথাসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা ‘পথের পাঁচালী’ বইটি ভাগলপুরে লেখা। মাত্র একুশ বছরের সাহিত্য-জীবনে তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, দিনলিপি এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘বনে পাহাড়ে’, ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’, ‘হিরে মানিক জ্বলে’, ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘আরণ্যক’, ‘অপরাজিত’, ‘ইছামতী’, ‘দেবযান’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’, ‘কিন্নরদল’ইত্যাদি। ‘উৎকর্ণ’, ‘স্মৃতির রেখা’, ‘অভিযাত্রিক’ প্রভৃতি হলো তাঁর দিনলিপি জাতীয় রচনা। তাঁর লেখায় পল্লী-প্রকৃতি এবং অরণ্য-প্রান্তর যেমন আশ্চর্য সজীবতা লাভ করেছে তেমনই গ্রামবাংলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে তাঁকে মরণোত্তর ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ প্রদান করা হয়।

তিনপাহাড়ের কোলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারে তিনপাহাড়ে ট্রেনের থেকে নেমে,
হাওয়াবিলাসী তিনজোড়া চোখ আটকে গেল ফ্রেমে।
জনমানববিহীন স্টেশন, আকাশ ভরা তারায়,
এমন একটি দেশে আসলে সক্কলে পথ হারায়।

পথ হারিয়ে যায় যেদিকে, সেদিকে পথ আছেই,
ঝরনা, কাঁদড়, টিলা, পাথর বনভূমির কাছেই।
বনভূমির ওপারে কোন মনোভূমির দ'য়,
ফুসুর ফাসুর ঘুসুর ঘাসুর স্বপ্নে কথা হয় !

পুব আকাশে আস্তে-ধীরে আলোর ঘোমটা খোলে,
শক্ত সবুজ গাঁ ভেসেছে তিনপাহাড়ের কোলে।
সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব?
তিনপাহাড়ের নক্‌শিকাঁথায় শিশুর কলবর।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) : বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। পড়াশুনো করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যয়ন অসমাপ্ত। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'যম' কবিতা লিখে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য'। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। প্রণীত-অনূদিত-সম্পাদিত কবিতা ও গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা ১১১। এগুলির মধ্যে 'ধর্মে আছি জিরাফেও আছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'কুয়োতলা', 'অবনী বাড়ি আছো?' তাঁর লেখা বিখ্যাত দুটি উপন্যাস। তিনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'কবিতা সাপ্তাহিকী' প্রকাশ করে কাব্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 'অতিথি অধ্যাপক' হিসেবে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় রত থাকাকালীন আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তিনি 'আনন্দ পুরস্কার', 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছেন।

জ্ঞানচক্ষু

আশাপূর্ণা দেবী

কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল!

নতুন মেসোমশাই, মানে যাঁর সঙ্গে এই কদিন আগে তপনের ছোটোমাসির বিয়ে হয়ে গেল দেদার ঘটাপটা করে, সেই তিনি নাকি বই লেখেন। সে সব বই নাকি ছাপাও হয়। অনেক বই ছাপা হয়েছে মেসোর।

তার মানে—তপনের নতুন মেসোমশাই একজন লেখক। সত্যিকার লেখক।

জলজ্যান্ত একজন লেখককে এত কাছ থেকে কখনো দেখেনি তপন, দেখা যায়, তাই জানতো না। লেখকরা যে তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর মতো মানুষ, এবিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।

কিন্তু নতুন মেসোকে দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তপনের।

আশ্চর্য, কোথাও কিছু উলটোপালটা নেই, অন্য রকম নেই, একেবারে নিছক মানুষ! সেই ওঁদের মতোই দাড়ি কামান, সিগারেট খান, খেতে বসেই 'আরে ব্যস, এত কখনো খাওয়া যায়?' বলে অর্ধেক তুলিয়ে দেন, চানের সময় চান করেন এবং ঘুমের সময় ঘুমোন।

তাছাড়া—

ঠিক ছোটো মামাদের মতোই খবরের কাগজের সব কথা নিয়ে প্রবলভাবে গল্প করেন, তর্ক করেন, আর শেষ পর্যন্ত 'এ দেশের কিছু হবে না' বলে সিনেমা দেখতে চলে যান, কী বেড়াতে বেরোন সেজেগুজে।

মামার বাড়িতে এই বিয়ে উপলক্ষ্যেই এসেছে তপন, আর ছুটি আছে বলেই রয়ে গেছে। ওদিকে মেসোরও না কী গরমের ছুটি চলছে। তাই মেসো শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন কদিন।

তাই অহরহই জলজ্যান্ত একজন লেখককে দেখবার সুযোগ হবেই তপনের। আর সেই সুযোগেই দেখতে পাচ্ছে তপন, 'লেখক' মানে কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তপনদের মতোই মানুষ।

তবে তপনেরই বা লেখক হতে বাধা কী?

মেসোমশাই কলেজের প্রফেসার, এখন ছুটি চলছে তাই সেই সুযোগে শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেছেন কদিন। আর সেই সুযোগেই দিব্যি একখানি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ছোটোমাসি সেই দিকে ধাবিত হয়।

তপন অবশ্য 'না আ-আ-' করে প্রবল আপত্তি তোলে, কিন্তু কে শোনে তার কথা?

ততক্ষণে তো গল্প ছোটোমেসোর হাতে চলেই গেছে। হইচই করে দিয়ে দিয়েছে ছোটোমাসি তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে।

তপন অবশ্য মাসির এই হইচইতে মনে মনে পুলকিত হয়।

মুখে আঁ আঁ করলেও হয়।

কারণ লেখার প্রকৃত মূল্য বুঝলে নতুন মেসোই বুঝবে। রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।

একটু পরেই ছোটোমেসো ডেকে পাঠান তপনকে এবং বোধকরি নতুন বিয়ের শ্বশুরবাড়ির ছেলেকে খুশি করতেই বলে ওঠেন, 'তপন, তোমার গল্প তো দিব্যি হয়েছে। একটু 'কারেকশান' করে ইয়ে করে দিলে ছাপতে দেওয়া চলে।'

তপন প্রথমটা ভাবে ঠাট্টা, কিন্তু যখন দেখে মেসোর মুখে করুণার ছাপ, তখন আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।

'তা হলে বাপু তুমি ওর গল্পটা ছাপিয়ে দিও—মাসি বলে, 'মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।'

মেসো তেমনি করুণার মূর্তিতে বলেন, 'তা দেওয়া যায়! আমি বললে 'সন্ধ্যাতারার' সম্পাদক 'না' করতে পারবে না। ঠিক আছে; তপন, তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেবো।'

বিকেলে চায়ের টেবিলে ওঠে কথাটা।

আর সবাই তপনের গল্প শুনে হাসে। কিন্তু মেসো বলেন, 'না -না আমি বলছি—তপনের হাত আছে। চোখও আছে। নচেৎ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা গল্প লিখতে গেলেই তো—হয় রাজারানির গল্প লেখে, নয় তো—খুন জখম অ্যাকসিডেন্ট, অথবা না খেতে পেয়ে মরে যাওয়া, এইসব মালমশলা নিয়ে বসে। তপন যে সেই দিকে যায়নি, শুধু ওর ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বিষয় নিয়ে লিখেছে, এটা খুব ভালো। ওর হবে।'

তপন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়।

তারপর ছুটি ফুরোলে মেসো গল্পটি নিয়ে চলে গেলেন। তপন কৃতার্থ হয়ে বসে বসে দিন গোনে।

এই কথাটাই ভাবছে তপন রাত-দিন। ছেলেবেলা থেকেই তো রাশি রাশি গল্প শুনেছে তপন আর এখন বস্তা বস্তা পড়ছে, কাজেই গল্প জিনিসটা যে কী সেটা জানতে তো বাকি নেই?

শুধু এইটাই জানা ছিল না, সেটা এমনই সহজ মানুষেই লিখতে পারে। নতুন মেসোকে দেখে জানল সেটা।

তবে আর পায় কে তপনকে?

দুপুরবেলা, সবাই যখন নিথর নিথর, তখন তপন আস্তে একটি খাতা (হোম টাস্কের খাতা আর কী! বিয়ে বাড়িতেও যেটি মা না আনিয়ে ছাড়েননি।) আর কলমটি নিয়ে তিনতলার সিঁড়িতে উঠে গেল, আর তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, একাসনে বসে লিখেও ফেলল আস্ত একটা গল্প।

লেখার পর যখন পড়ল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তপনের, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

একী ব্যাপার!

এ যে সত্যিই হুবহু গল্পের মতোই লাগছে! তার মানে সত্যিই একটা গল্প লিখে ফেলেছে তপন। তার মানে তপনকে এখন 'লেখক' বলা চলে।

হঠাৎ ভয়ানক একটা উত্তেজনা অনুভব করে তপন, আর দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এসে—ছোটোমাসিকেই বলে বসে, 'ছোটোমাসি, একটা গল্প লিখেছি।'

ছোটোমাসিই ওর চিরকালের বন্ধু, বয়সে বছর আষ্টেকের বড়ো হলেও সমবয়সি, কাজেই মামার বাড়ি এলে সব কিছুই ছোটোমাসির কাছে। তাই এই ভয়ানক আনন্দের খবরটা ছোটোমাসিকে সর্বাগ্রে দিয়ে বসে।

তবে বিয়ে হয়ে ছোটোমাসি যেন একটু মুরুব্বি মুরুব্বি হয়ে গেছে, তাই গল্পটা সবটা না পড়েই একটু চোখ বুলিয়েই বেশ পিঠ চাপড়ানো সুরে বলে, 'ওমা এ তো বেশ লিখেছিস রে? কোনোখান থেকে টুকলিফাই করিসনি তো?

'আঃ ছোটোমাসি, ভালো হবে না বলছি।'

'আরে বাবা খেপছিস কেন? জিজ্ঞেস করছি বই তো নয়! রোস তোর মেসোমশাইকে দেখাই—।'

কিন্তু গেলেন তো—গেলেনই যে।

কোথায় গল্পের সেই আঁটসাঁট ছাপার অক্ষরে গাঁথা চেহারাটি? যার জন্যে হাঁ করে আছে তপন? মামার বাড়ি থেকে বাড়িতে চলে এসেও।

এদিকে বাড়িতে তপনের নাম হয়ে গেছে, কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী। আর উঠতে বসতে ঠাট্টা করছে 'তোর হবে। হ্যাঁ বাবা তোর হবে।'

তবু এইসব ঠাট্টা-তামাশার মধ্যেই তপন আরো দু'তিনটে গল্প লিখে ফেলেছে। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, হোম টাস্ক হয়ে ওঠেনি, তবু লিখছে। লুকিয়ে লিখছে। যেন নেশায় পেয়েছে।

তারপর ছুটি ফুরোল, রীতিমতো পড়া শুরু হয়েছে। প্রথম গল্পটি সম্পর্কে একেবারে আশা ছাড়া হয়ে গেছে, বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে আছে এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা।

ছোটোমাসি আর মেসো একদিন বেড়াতে এল, হাতে এক সংখ্যা 'সন্ধ্যাতারা'।

কেন? হেতু? 'সন্ধ্যাতারা' নিয়ে কেন?

বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।

তবে কী? সত্যিই তাই? সত্যিই তপনের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি এল আজ?

কিন্তু তাই কী সম্ভব? সত্যিকার ছাপার অক্ষরে তপন কুমার রায়ের লেখা গল্প, হাজার-হাজার ছেলের হাতে হাতে ঘুরবে?

পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?

তা ঘটেছে, সত্যিই ঘটেছে।

সূচিপত্রেও নাম রয়েছে।

'প্রথম দিন' (গল্প) শ্রীতপন কুমার রায়।

সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়, তপনের লেখা গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওর লেখক মেসো ছাপিয়ে দিয়েছে! পত্রিকাটি সকলের হাতে হাতে ঘোরে, সকলেই একবার করে চোখ বোলায় আর বলে, 'বারে, চমৎকার লিখেছে তো।'

মেসো অবশ্য মৃদু মৃদু হাসেন, বলেন, 'একট-আধটু 'কারেকশান' করতে হয়েছে অবশ্য। নেহাত কাঁচা তো?'

মাসি বলে, 'তা হোক, নতুন নতুন অমন হয়—'

ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।

ওই কারেকশানের কথা।

বাবা বলেন, 'তাই। তা নইলে ফট করে একটা লিখল, আর ছাপা হলো,—'

মেজোকাকু বলেন, 'তা ওরকম একটি লেখক মেসো থাকা মন্দ নয়। আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতাম।'

ছোটোমাসি আত্মপ্রসাদের প্রসন্নতা নিয়ে বসে বসে ডিম ভাজা আর চা খায়, মেসো শুধু কফি।

আজ আর অন্য কথা নেই, শুধু তপনের গল্পের কথা, আর তপনের নতুন মেসোর মহত্ত্বের কথা। উনি নিজে গিয়ে না দিলে কি আর 'সন্ধ্যাতারা'-র সম্পাদক তপনের গল্প কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁতো?

তপন যেন কোথায় হারিয়ে যায় এইসব কথার মধ্যে। গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, ‘কই তুই নিজের মুখে একবার পড় তো তপন শুনি! বাবা, তোর পেটে পেটে এত!’

এতক্ষণে বইটা নিজের হাতে পায় তপন।

মা বলেন, ‘কই পড়? লজ্জা কী? পড়, সবাই শুনি।’

তপন লজ্জা ভেঙে পড়তে যায়।

কেশে গলা পরিষ্কার করে।

কিন্তু এ কী!

এসব কী পড়ছে তপন?

এ কার লেখা?

এর প্রত্যেকটি লাইন তো নতুন আনকোরা, তপনের অপরিচিত।

এর মধ্যে তপন কোথা?

তার মানে মেসো তপনের গল্পটিকে আগাগোড়াই কারেকশান করেছেন। অর্থাৎ নতুন করে লিখেছেন, নিজের পাকা হাতে কলমে! তপন আর পড়তে পারে না। বোবার মতো বসে থাকে। তারপর ধমক খায়, ‘কীরে তোর যে দেখি পায়া ভারী হয়ে গেল। সবাই শুনতে চাইছে তবু পড়ছিস না? না কি অতি আহ্লাদে বাক্য হরে গেল?’

তপন গড়গড়িয়ে পড়ে যায়। তপনের মাথায় ঢোকে না—সে কী পড়ছে। তবু ‘ধন্যি ধন্যি’ পড়ে যায়। আর একবার রব ওঠে তপনের লেখক মেসো তপনের গল্পটি ছাপিয়ে দিয়েছে।

তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়, তপন ছাতে উঠে গিয়ে শার্টের তলাটা তুলে চোখ মোছে। তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। কেন? তা জানে না তপন।

শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন, যদি কখনো লেখা ছাপতে দেয় তো, তপন নিজে গিয়ে দেবে। নিজের কাঁচা লেখা। ছাপা হয় হোক, না হয় না হোক।

তপনকে যেন আর কখনো শুনতে না হয় ‘অমুক তপনের লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে।’

আর তপনকে যেন নিজের গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা লাইন পড়তে না হয়।

তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—১৯৯৫) : অন্যতম প্রধান বাঙালি লেখিকা। জন্ম কলকাতায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ অসামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও পরিচিত সমাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প এবং ছোটোদের জন্য অজস্র বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — ‘ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘বকুলকথা’, ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘সাগর শুকায়ে যায়’, ‘শশীবাবুর সংসার’, ‘সোনার হরিণ’ ইত্যাদি। তাঁর রচিত অন্তত ৬৩টি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’, ‘সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার’, ‘জ্ঞানপীঠ পুরস্কার’, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডি. লিট’ এবং নানা সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

বুধুয়ার পাখি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জানো এটা কার বাড়ি? শহুরে বাবুরা ছিল কাল,
ভীষণ শ্যাওলা এসে আজ তার জানালা দেয়াল
ঢেকে গেছে, যেন ওর ভয়ানক বেড়ে গেছে দেনা,
তাই কোনো পাখিও বসে না।
এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে নীল পাখি নিকোনো নরম উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে...
বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।

এবার রিখিয়া ছেড়ে বাবুডির মাঠে
বুধুয়া অবাক হয়ে হাঁটে,
দেহাতি পথের নাম ভুলে
হঠাৎ পাহাড়ে উঠে পাহাড়ের মতো মুখ তুলে
ভাবে : ওটা কার বাড়ি, কার অত নীল,
আমার ঘরের চেয়ে আরো ভালো, আরো
নিকোনো উঠোন তার, পাখিবসা বিরাট পাঁচিল।
ওখানে আমিও যাব, কে আমায় নিয়ে যেতে পারো?

এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে
কানায় কানায় আলো পথের কলশে ভরা থাকে,
ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি,
রুপোলি ডানায় যারা নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি।।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) : জন্ম কলকাতায়। পড়াশুনো করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একালের বিখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ইংরেজি ও জার্মান ভাষাতেও তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— 'যৌবন বাউল', 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'গিলোটিনে আলপনা', 'জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায়', 'এক একটি উপভাষায় বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি। 'ধুলো মাখা ঈথারের জামা' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পান। বহু প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন গ্যোয়টে, ব্রেশট সহ বহু জার্মান কবির কবিতা ও নাটক। জার্মানির 'গ্যোয়টে পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার' ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সুধা বসু পুরস্কার' পেয়েছেন।

অসুখী একজন

পাবলো নেরুদা

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম
অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রেখে দরজায়
আমি চলে গেলাম দূর... দূরে।

সে জানত না আমি আর কখনো ফিরে আসব না।

একটা কুকুর চলে গেল, হেঁটে গেল গির্জার এক নান
একটা সপ্তাহ আর একটা বছর কেটে গেল।

বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল আমার পায়ের দাগ
ঘাস জন্মালো রাস্তায়

আর একটার পর একটা, পাথরের মতো
পর পর পাথরের মতো, বছরগুলো
নেমে এল তার মাথার ওপর।

তারপর যুদ্ধ এল
রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো।
শিশু আর বাড়িরা খুন হলো।
সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো না।

সমস্ত সমতলে ধরে গেল আগুন
শান্ত হলুদ দেবতারা
যারা হাজার বছর ধরে
ডুবে ছিল ধ্যানে
উল্টে পড়ল মন্দির থেকে টুকরো টুকরো হয়ে
তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।
সেই মিষ্টি বাড়ি, সেই বারান্দা
যেখানে আমি ঝুলন্ত বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম,
গোলাপি গাছ, ছড়ানো করতলের মতো পাতা
চিমনি, প্রাচীন জলতরঙ্গ
সব চূর্ণ হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে।

যেখানে ছিল শহর
সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা
দোমড়ানো লোহা, মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস
মাথা
রক্তের একটা কালো দাগ।

আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।

তরজমা : নবারুণ ভট্টাচার্য

পাবলো নেরুদা (১৯০৪—১৯৭৩) : প্রখ্যাত কবি, কূটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা চিলির সীমান্ত শহর পারলেতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নেকতালি রিকার্দো রেয়েন্স বাসোয়ালতো। ‘পাবলো নেরুদা’ নামটির উৎস চেক লেখক জাঁ নেরুদা এবং পাবলো নামটির সম্ভাব্য উৎস পাবলো পিকাসো। মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনই লিখেছেন ঐতিহাসিক মহাকাব্য, প্রকাশ্য রাজনৈতিক ইস্তাহার। ১৯২৭ সালে চিলির সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদূত করে রেঙ্গুনে পাঠায়। এ পদে থেকে তিনি চিন, জাপান, কলম্বোসহ ভারতেও আসেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। চিলিতে অগাস্তো পিনোচেতের নেতৃত্বাধীন সামরিক অভ্যুত্থানের সময় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন নেরুদা। তিনদিন পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘কুড়িটা প্রেমের কবিতা এবং একটি হতাশার গান’, ‘এ পৃথিবীর আবাসভূমি’, ‘প্রাণের স্পেন’, ‘বিশ্বসংগীত’, ‘চিলির পাথর’, ‘হোয়াকিন মুরিয়েতার গরিমা ও মৃত্যু’, ‘ক্যাপ্টেনের কবিতা’, ‘শীতের বাগিচা’ ইত্যাদি।

আমাকে দেখুন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর নীরেট জমাট ভিড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোঁকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড়ো উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারও গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দু-ধারে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছে না কেউ। ওইটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু লক্ষ করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি, তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু

নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনো ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি—টেকোমানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়োও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দু-ধারে উঁচু উঁচু মানুষ—এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাব, সেই কারণেই কিছু নমস্কারি কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনো অর্থ হয় না, বরাবর আমার বাসার কাছে কাটরায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফস্সলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখেনি, আর দুই নম্বর কারণ হলো আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে, কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভ্রূ একটু ঊর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ওই নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কী নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকান-পসার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে-কোনো দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে! আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরির চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পসারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলেছিল বটে, আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কিনা তা সে লক্ষ করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফস্সলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আমি উঁকি মেরে

দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হলো ওর মুখ দেখে, তবু আর একটু খেলিয়ে ধরা দেবো বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ গলি সে গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে-চোখেই রাখছিলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে, এবার আমাকে না পেলে ও কেঁদেই ফেলবে— এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী! চোখ দুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উলটোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! বিপরীত দিক থেকে ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হলো আমাদের, এমন কী ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি—ও কি আমাকে দেখেনি। আবার আমি অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উলটোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজন লক্ষ করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও, এমনকি পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হলো—কখনও বইয়ের দোকানের সামনে কখনও ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনো বারই চিনতে পারল না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে গেল। তখন আমি ভাবলাম মফস্‌সলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে! ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে-টেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস পেলে কেঁপে কেঁপে এসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হলো ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময় ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ওই লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বারবার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু আমি বারবার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনো লুকিও না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কনডাক্টর, এইখানেই আমি নেবে যাব—দেখি দাদা...দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ওই দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কনডাক্টর বাস ছাড়ার ঘন্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশামাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলেছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। ওই তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দেখো আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি ভেঙে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটটা বোধহয় একশো বছরের পুরোনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল—ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বেয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছ-দিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটোটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স চব্বিশ কী সাতাশ, যখন আমার ভালো করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! যদি সত্যিই জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হা হা করে হেসে উঠে বলবে—আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনোকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

আমার চাকরি ব্যাংকে। দোতলায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসেবেও আমি খুব পাকা। তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনও পেমেন্ট, কখনও রিসিভিঙে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওলা একটা ড্রয়ার। তার কোনটায় কত টাকার নোট তার কোনটায় কোন খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার...তারপর টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে...তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার—ইস লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করেছ—কী একঘেয়ে! ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড়ো খদ্দের—প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশির ভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড়ো শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের বড়ো একটা রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু! একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড়ো একটা ভাবি না। অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয়নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন—কোথায় দেখেছি বলুন তো। মনেই পড়ছে না। তখন শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা—তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাংকের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ-এ...সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জিন-এর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন—চিনেছি। কী জানেন, ওই ঘুলঘুলি আর ওই খাঁচার মধ্যে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়...বুঝলেন না! আসল কথা হলো ওই পারসপেকটিভ—ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ওই খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন আপনি, তেমনি দেখুন এই কোট-প্যান্ট টাই আর টাক মাথা—এর মধ্য দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর

আমি—আমাদের কোনো সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসপেকটিভের কথাই ভাবছিলাম! ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম রেলকলোনিতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ-মা বলে বাসায় আদর ছিল না। আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে মাঝে বসত। জড়োসড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনও আমার কাঁদুনে ছোটো বোনটাকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াত! মা আমাকে বলত—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভালো করে দেখতাম—আ কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা—আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে বলে ও আসেনি। রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তারপর কী হলো, সে কী মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন—না না মরবে কেন। তাকে আমি বিয়ে করেছি বড়ো হয়ে। সে এখনও আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে, বদমেজাজি, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই। সেই বেলী—যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে এক গাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল—সেই ভালোবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ—সে মুখ বড়ো মায়ামমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালোবাসায় আমার মুখ ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাব। বুঝলেন না...বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই যে ঘুলঘুলিটা—যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল—ওই ঘুলঘুলিটা...

এই যে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেন্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউন্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার আছে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাংকে। মাঝে-মধ্যে চোখে চোখ পড়লে আমি হেসে জিজ্ঞেস করি—কী, বাবা ভালো তো! ও খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলে—হ্যাঁ—। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনো লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় এ জায়গায়, তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাতটা। তখনও ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউন্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যি কখনও আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকাটির কথা ভাবছে এখন, শীগগিরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপশনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দু-খানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি যে, ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরে দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে নীচে যাব টিফিন করতে। তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন এরারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও!

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া—বলো কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ওই সুন্দর হলুদ রং, মসৃণ গা, প্রকাণ্ড চেহারা—মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দু-দিন পর পর কলা খাই। দাও একটা। না, না ওই একটাই—এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমনকি খুব কঠিন কোনো কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—উনিশশো উনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু-হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রিক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে, আমাকে দেখুন; এই যে আমি—অরিন্দম বসু—অরিন্দম বসু—এই যে না-লম্বা, না-রোগা, না-ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রিক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ওই শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু—এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনো ধরতে পারবেন?

যাক গে সেসব কথা! মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাংকের ওই ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়, কেউ কেউ মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ওইভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে—কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়!

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম! উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে। দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে। হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভালো'। তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হলো। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোলা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি!

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না মশাই, ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোকা মানুষ ওতে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভালো যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে-কোনো জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাব বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ওইদিকে—না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনও গোল হয়নি। আর ওই ছেলেটা—হায় ঈশ্বর, কে ওকে ওই লাল সোনালি জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিনতো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে! আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে! তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি ন-মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে! ক্ষুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ওই যে ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দেখো, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু, তুমি কি বোঝো সেসব? তুমি তো জানোই না যে, আমি—এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কী রকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে। আমি কাঁদি কিংবা হাসি—কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হলো না। রেফারি ওই লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কী রকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোকা। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। এই যে সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভালো করে ভাত খেতে পারিনি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লিগ টেবিলে আপনার টিমের অবস্থা ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সাড়ে উনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে

আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড়ো দেরি করছে। তাই, আমি— অরবিন্দ বসু, ব্যাংকের ক্যাশ ক্লার্ক— আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ওই যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোটো ছেলেটা— হাপু। বড়ো দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে— রথের মেলায় যাব বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ওই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নীচে জ্বলজ্বল করছে দু-খানা চোখ, আমি এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল— ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে— হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উ—উ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়— কত দেরি করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই, বাইরে থেকে ফিরে এলে— এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা। মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে নিচ্ছি যেন! বললাম— যাব বাবা, বড়ো খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল— শীগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড়ো মায়ায় বললাম— আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ওই নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড়ো ভালো লাগে আমার।

বড়ো দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিকমতো মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে—ওটা কী বাবা! আর ওটা! আর ওইখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই— ওটা নাগরদোলা। ওইটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপর ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ওই যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হি হি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম দেয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘণ্টার সার্কাস দেখলাম দুজন। দুই মাথাওলা মানুষ সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা থেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ওই তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজানো একগাদা হুইশ্‌ল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে, যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রংচং বল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে....ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু.... আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোকা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হলো, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম।

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড়ো দুরন্ত ছেলে! দেখেননি? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল জ্বলজ্বলে দুটো দুষ্টু চোখ....না, না, ওই পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একইরকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা, অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন জন—ঠিক কোন জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন জন—ঠিক কোন জন—বুঝলেন না, ওর মাও একবার ঠিক করতে পারেনি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই যে আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইন্ডলি, ভুলে যাবেন না—

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) : ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ময়মনসিংহে জন্ম। পিতার রেলে চাকরির সূত্রে আশৈশব যাযাবর জীবন দেশের নানা স্থানে। স্কুলশিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা, পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা', প্রথম কিশোর উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'গোঁসাই বাগানের ভূত', 'নৃসিংহ রহস্য', 'পাগলা সাহেবের কবর', 'বক্সার রতন', 'হীরের আংটি', 'পাতালঘর' ইত্যাদি। বহু ছোটোগল্প লিখেছেন। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন ১৯৮৫ সালের 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার'। বড়োদের জন্য লিখেছেন— 'শ্যাওলা', 'মানবজমিন', 'দূরবীন', 'পার্থিব', 'চক্র' প্রভৃতি উপন্যাস। পেয়েছেন 'আনন্দ পুরুস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার।

আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি

শঙ্খ ঘোষ

আমাদের ডান পাশে ধ্বস
আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ
আমাদের মাথায় বোমারু
পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ
আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে

আমাদের শিশুদের শব
ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!
আমরাও তবে এইভাবে
এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?
আমাদের পথ নেই আর
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস
পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২) :, অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একজন প্রধান কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। পড়াশুনো প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দিনগুলি রাতগুলি’। ‘নিহিত পাতাল ছায়া’, ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’, ‘জলই পাষাণ হয়ে আছে’, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’, ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’, ‘ধূম লেগেছে হৃৎ কমলে’, ‘গোটা দেশজোড়া জউঘর’, ‘প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে’, ‘হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ’ ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— ‘ছোট্ট একটা স্কুল’, ‘অল্পবয়স কল্পবয়স’, ‘সকালবেলার আলো’, ‘সুপুরিবনের সারি’, ‘শহর পথের ধুলো’ ইত্যাদি। ‘কুন্তক’ ছদ্মনামে লিখেছেন ‘শব্দ নিয়ে খেলা’ ও ‘কথা নিয়ে খেলা’। প্রবন্ধের বই হিসেবে ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক’, ‘ছন্দোময় জীবন’, ‘ভিন্ন রুচির অধিকার’, ‘এই শহরের রাখাল’, ‘ঐতিহ্যের বিস্তার’, ‘এ আমির আবরণ’, ‘ছন্দের বারান্দা’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কবির প্রাপ্ত নানা পুরস্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, কবীর সম্মান, সরস্বতী সম্মান এবং পদ্মভূষণ।

আলোবাবু

বনফুল

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুন-পোড়ার মতো, তাঁর উপর কালো গোঁফ-দাড়ি, যুগ্ম-ভ্রু, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হয়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলুথালু জামা গায়ে দিতেন না, জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই দিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

কী চাই আপনার?

অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে?

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে, অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম ইনিও বোধ হয় সেই দলের মনে মনে

একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কী করতে হবে —

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোটো থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোটো পাখির ছানা বার করলেন।

একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে এর পায়ে লেগেছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল কিনা, একটু দেখবেন দয়া করে? শুনেছি আপনি বড়ো ডাক্তার।

দেখলাম পাখির ছানাটিকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

কী করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন?

না। ভালো হলে ছেড়ে দেবো। জীবন্ত কোনো জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্যে বিয়েও করিনি।

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে একটু হেসে চাইলেন আমার দিকে।

ও। এর আগে তো দেখিনি আপনাকে, কোথায় থাকেন?

অবিনাশবাবুর বাড়িতে। দিন সাতেক হলো এসেছি।

আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশবাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন। অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি?

না, তেমন কিছু নয়। আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাগনীর বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন। আলোবাবু পাখির ছানাটি নিয়ে চলে গেলেন।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই এক মুখ হেসে বললেন, বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষার শখ আছে কিন্তু সেবা করতে জানেন না, দুটো চোখে এতক্ষণ পিচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয় —

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হলো একটু পরে।

বললাম, আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরিবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, এক পাখি-পেশেন্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।

দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড়ো ভালোবাসে, বিশেষত সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয় —

দিন কতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হলো। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন বললে, এখানকার হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশি এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাশ করলে তখন মাইনে বাড়বে —

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন আমার ল্যাবরেটরিতে এসে শুষ্ক মুখে বসে আছেন।

কী খবর —

আমাকে দূর করে দিলে।

কেন?

একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও — তাহলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার! ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন, কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছ! আমি আর কী বলব, চুপ করে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—

আমি চুপ করে রইলাম, কী আর বলব! সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কী করব ভেবে পেলাম না।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হলো আলোবাবুকে। শুনলাম অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুরের বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশবাবুর শিশু-পুত্র তিনুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে।

একদিন সন্ধের পর এসে দেখলাম তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুন গুন করে গান গাইছেন।

আপনি গান-বাজনা জানেন নাকি —

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

এককালে ডুগি-তবলা বাজাতে পারতাম। দৈন্যের দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই —

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

হ্যাট পেলেন কোত্থেকে —

অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে, ওই হ্যাটটি আছে কেবল।

আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিন কয়েক পর। একদিন দেখি তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

কী হলো, ছুটছেন কেন —

দশটা বেজে গেছে আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয়নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্চা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলাম, আমার ঘড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দিই। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারির খেতে দেরি হয়ে গেল আজকে —

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে তা জানতাম না। তাঁর পিছু পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘরে ঢুকেই তিনি নিজের ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভেতর থেকে বার করলেন একটি ছোটো টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়ার ছোটো পুঁটুলির মতন কী বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটুলি বেরিয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমি ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হলো খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুলের মতো রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখ বুজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হলো যেন পুজো করছেন।

অবিনাশবাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালোবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধহয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি, আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছেন। দুটো লাইনই বার বার গাইছেন —

আমায় ওরা সইলো না কেউ/আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খনিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনিনি কখনও তাঁকে। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

আজ এত জোরে গান গাইছেন যে!

এমনি।

তারপর আমার দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন, আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিক সময় হয়তো ভালো করে দম দিতে পারবে না —

টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলা গারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

বনফুল (১৮৯৯—১৯৭৯) : সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'বনফুল'। তাঁর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারীতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'বনফুল' ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটোগল্পেরও জনক তিনি। ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস—সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সমান দক্ষ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'পশ্চাৎপট' রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

পৃথিবী বাড়ুক রোজ

নবনীতা দেবসেন

বিশ্ব ছোটো হয়ে যাক হস্তধৃত আমলকীর মতো,
এ আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি চাই পৃথিবী ছড়াক
আমার পৃথিবী আমি পরিশ্রম করে খুঁজে নেব।
পৃথিবী, বিস্তীর্ণা হও, ব্যাপ্ত হও ব্রহ্মচরাচর,
আকীর্ণ ছড়িয়ে পড়ো, আরও, আরও নিঃসীম সময়
আমার পৃথিবী হোক অফুরান, অনন্ত বিস্তার
পৃথিবী, বর্ধিষ্ণু হও, আমি ছোটো, আরো ছোটো হই।

আমি ছোটো হতে হতে একগুচ্ছ রেশমের মতো
নরম ও নিরাকার, যৎসামান্য ইশারা পেলেই
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রাজপুতানি মখমলের শাড়ি —
আংটির ফোকর দিয়ে সবিনয়ে গলে চলে যাব।

পৃথিবী অনেক বড়ো, পৃথিবীকে ছোটো হতে নেই।

পশুপাখি উদ্ভিদেরা কিছুমাত্র বিস্মিত হবে না
ওরা সব জেনে গেছে, মানুষের বেশি দেরি নেই।

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮) : কবি নরেন্দ্র দেব এবং সুলেখিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কন্যা। কবিতা, গদ্য, ভ্রমণকাহিনি—সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'প্রথম প্রত্যয়'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'স্বাগত দেবদূত' ; 'আমি, অনুপম'; 'নটী নবনীতা'; 'খগেনবাবুর পৃথিবী'; 'গল্পগুজব'; 'মঁসিয়ে হুলোর হলিডে'; 'সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী'; 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে'; 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে'; 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে'; 'নব-নীতা' প্রভৃতি। কৌতুকপ্রবণতা এবং অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি তাঁর বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার এবং শিশু সাহিত্যে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' পেয়েছেন।

আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।

সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল, তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে॥

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ম তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে॥

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;

কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল
সুন্দরের আরাধনা॥

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল—
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী ও বালক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings' এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। কবির প্রথম জীবনে লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'কড়ি ও কোমল'। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ — মাত্র আট বছরে কবি প্রতিভার যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে তারই চিহ্ন সুমুদ্রিত এই পর্বের চারখানি কাব্যগ্রন্থে — 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'তে। এই পর্বের কাব্যগুলিতে কবির আত্মোপলব্ধিই শুধু নয়, তাঁর কাব্যে নির্মাণ কৌশলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবেগ, গভীর আত্মপ্রত্যয়, জীবন জিজ্ঞাসা, কল্পনার পক্ষ বিস্তার, শিল্পরূপ নির্মাণে দক্ষতা, ভাষা ও ছন্দের ওপর আধিপত্য প্রভৃতি কবির যাবতীয় গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে এই পর্বের কবিতাবলিতে। এরপর কবি রচনা করেন কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য। গীতাঞ্জলি পর্বের প্রধান তিনখানি কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি, ১৯১৬ তে বলাকা, ১৯২৫ এ পূরবী এবং ১৯২৯-এ মহুয়া রচনা করেন কবি রবীন্দ্রনাথ। 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'শেষ সপ্তক', 'প্রান্তিক', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ইত্যাদি।

লোকমাতা রানি রাসমণি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

১২০০ বঙ্গাব্দ, ১১আশ্বিন, বুধবার সকালে, হালিশহরে মাহিষ্যবংশে রাসমণির জন্ম। দরিদ্রের কন্যা। পিতা স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিলেন হারু ঘরামি নামে। হারু ঘরামির মেয়ে রাসমণি। মায়ের নাম রামপ্রিয়া। মা টুকটুকে ফর্সা এই মেয়েটির নাম রাখলেন রানি। পরে হবে রাসমণি। আর গ্রামবাসীরা দুটি নাম একত্রিত করে বলতে লাগলেন, রানি রাসমণি। একদিন যে সত্যই তিনি রানি হবেন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, বাংলার রানি রাসমণি। দু'জনেই যুদ্ধ করবেন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে।

পিতা হরেকৃষ্ণ, লোকমুখে হারু। সামান্য লেখাপড়া জানতেন। মেয়েকেও শিখিয়েছিলেন। যে পল্লিতে তিনি বাস করতেন একমাত্র তাঁরই বাড়িতে রাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ করা হতো। গ্রামবাসীরা লণ্ঠন হাতে শুনতে আসতেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বালিকা রাসমণি অবাক হয়ে দেখতেন — অন্ধকার পথে আলোর সারি মাঠ পেরিয়ে, যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। আলো হাতে এসেছিল তীর্থে, এখন ফিরে যাচ্ছে সবাই দল বেঁধে। সব মানুষের ভেতরেই যেন দুটো মানুষ থাকে। মামলা, মোকদ্দমা, দলাদলি, মারামারি, অভাব, অসুখ সবই আছে কিন্তু রাতের আলোয় অতীতের পথ চিনে নেওয়ার আগ্রহ কিছু কম নেই। মহাভারতের-ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা— সবাই আছেন, চিরকাল থাকবেন। রাসমণির বালিকা হৃদয়ে একটা সুখ-সুখ ভাব আসে। ভীষণ একটা ভালোলাগা।

বৈষ্ণব পরিবার। গলায় তুলসীর মালা, নাকে তিলক। এই তিলক আঁকায় সকলেরই কিছু সময় যায়। তা যাক। এ যে ধর্ম! রাসমণিও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে নাকে, কপালে, বাহুতে তিলক আঁকতেন। সুন্দরীকে আরো সুন্দর দেখাতো। রাসমণির মা রামপ্রিয়া বেশিদিন বাঁচেননি। রাসমণি সাতবছরে পা দিয়ে দেখলেন মা নেই। তিনি মা-হারা। মাত্র আটদিনের জ্বরে পরলোকে চলে গেলেন রামপ্রিয়া।

রাসমণির বয়স হলো এগারো বছর। চোখে পড়ার মতো সুন্দরী। সেই সময় কলকাতায় অনেক বড়োলোক। বড়ো বড়ো লোক। একদিকে জোড়াসাঁকো, অন্যদিকে জানবাজার, মাঝখানে মানিকতলা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রিন্স দ্বারকানাথ, মানিকতলায় রাজা রামমোহন, সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সিমুলিয়ার দত্তবংশ — যেখানে আসবেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিদেশিরাও এসে গেছেন — ডেভিড হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা বন্ধ করে শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। আলেকজান্ডার ডাফ সাহেব খ্রিস্টধর্মের প্রচারে উদ্যোগী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ বড়ো হচ্ছেন। ব্রাহ্মসমাজের দরজা এইবার খুলবে। বাঙালির জাগরণের কাল ধর্মে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে। বাঙালি ব্যবসাতেও নেমেছে। লক্ষ্মীলাভের সুযোগ এসেছে। সমুদ্র ডাকছে। স্বদেশ, বিদেশে বিপুল বাণিজ্য।

কলকাতার জানবাজার। অনেক অনেক বছর আগে জন সাহেব এখানে একটি বাজার করেছিলেন। লোকমুখে জনবাজার হয়ে গেল 'জানবাজার'। এখন যেখানে ফ্রিস্কুল স্ট্রিট, নিউ মার্কেট — তারই পাশে। এই জানবাজারের এক ধনী বাঙালির নাম প্রীতিরাম দাস। ছিলেন গরিব, হয়েছেন ধনকুবের। কেউ করে দিতে পারে না, নিজেকে হতে হয়। এই হলো জগতের নিয়ম। উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মী, সরস্বতী দুটিই লাভ হয়। পলাশিযুদ্ধের চারবছর আগে ১৭৫৩ সালে এক দরিদ্র পরিবারে প্রীতিরামের জন্ম। গুরুমশায়ের পাঠশালায় সামান্য বাংলাভাষা ও গণিত শিখেছিলেন, এমন সময় পিতা এবং মাতা দুজনেই মারা গেলেন। তখন প্রীতিরামের বয়স চোদ্দো বছর। এইবার কী হবে! একা তো নয়। পরপর দুটি ভাই — রামতনু ও কালীপ্রসাদ। চোদ্দো বছরের দাদা মহা চিন্তায় পড়লেন। ভাগ্যদেবীর পরীক্ষা!

জানবাজারে সেই সময় বাস করছেন বিখ্যাত জমিদার মান্নাবাবু। সেই পরিবারের গৃহিনী প্রীতিরামের এক পিসি। প্রীতিরাম তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে এই মান্নাপরিবারে আশ্রয় নিলেন। উদ্যোগী প্রীতিরাম জীবনের কাছে হার স্বীকার করার জন্যে জন্মাননি। ইতিহাসের উপাদান। ইংরেজের কলকাতা। চতুর্দিকে টাকা উড়ছে। ধরতে পারলেই ধনী। প্রীতিরাম অল্প, কাজ-চলা গোছের ইংরিজি শিখে দালালি ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রসদ যোগাবার কাজে নেমে পড়লেন। ইংরেজ সৈন্যদের মাল সরবরাহ। ফোর্টের এক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সুনজরে পড়লেন প্রীতিরাম। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তিনি ওই সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় গেলেন। সাহেবের সুপারিশে নাটোর রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রচুর টাকা রোজগার করে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। যুবক প্রীতিরাম। যথেষ্ট বিত্তশালী। আশ্রয়দাতা মান্নাপরিবারের যুগল মান্নার এগারো বছরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো। যৌতুক হিসাবে পেলেন জানবাজারের কয়েকখানা বাড়ি ও ষোলো বিঘা জমি। পর পর দুটি পুত্রলাভ করলেন। ১৭৭৯ সালে প্রথম পুত্র হরচন্দ্র, ১৭৮৩-তে দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র।

প্রীতিরামের ভাগ্য তর তর করে এগোচ্ছে। কলকাতাও ক্রমশ জমজমাট হচ্ছে। প্রীতিরাম আমদানি, রপ্তানির ব্যবসা শুরু করলেন। ১৭৮৭ সালে বার্ন কোম্পানির মুৎসুদ্দি হলেন। মুৎসুদ্দি আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ প্রধান, প্রতিনিধি। নাটোররাজের অধিকারস্থ কয়েকটি পরগনা খাজনা বাকি পড়ায় নিলামে উঠল। ১৮০০ সালে। প্রীতিরাম দেওয়ান শিবরাম সান্যালের সহায়তায় উনিশ হাজার টাকায় মকিমপুর পরগনাটি কিনে নিলেন। ছোটোভাই কালীপ্রসাদকে এই পরগনার নায়েব নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখান থেকে জানবাজারের বাড়িতে বাঁশ, কাঠ, মাছ চালান দিতে লাগলেন। প্রীতিরাম ওইসব পণ্য বিক্রির জন্যে বেলেঘাটায় একটি আড়ত খুললেন। সেকালে অনেক বাঁশ একসঙ্গে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে আনা হতো। একে চলিত কথায় বলা হতো, 'বাঁশের মাড়'। বংশব্যবসায়ী প্রীতিরাম ব্যবসাগত উপাধি লাভ করলেন, 'মাড়'। এই সময়েই বেলেঘাটায় তিনি একটি লবণের আড়তও স্থাপন করলেন। ধনলাভের সব পথই খুলে গেল। অনাথ প্রীতিরাম কলকাতার এক নম্বর বড়োলোক।

প্রীতিরাম তাঁর দুই পুত্রকে সেই যুগানুসারী লেখাপড়া শেখালেন। কলকাতা সেইসময়ে শিক্ষার আলোকে জাগছে। ছেলেদের বিবাহ দিলেন। বড়ো ছেলে হরচন্দ্র এত সুখ, এত প্রাচুর্য বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না। নিঃসন্তান স্ত্রীকে রেখে চিরবিদায় নিলেন অকালে।

১৮০২ সালে কনিষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বছর না পেরোতেই স্ত্রী-বিয়োগ। পরের বছরে আবার বিবাহ। এবারেও সেই একই ব্যাপার। বিয়ের বছরেই স্ত্রীর মৃত্যু। আশ্বর্যের ব্যাপার! হ্যাঁ, আশ্চর্যই। এইবার রাজচন্দ্রের স্ত্রী হয়ে আসবেন অলৌকিক এক রমণী, শক্তিরূপা। জানবাজার, জানবাজারের এই পরিবার এবং এই বঙ্গদেশকে তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ করবেন। ইতিহাসে সংযুক্ত করবেন উজ্জ্বল এক অধ্যায়। বাংলার নবজাগরণের পুরোহিত।

প্রীতিরাম রাজচন্দ্রের আবার বিবাহ দেবেন। পাত্রীর খোঁজ চলেছে। রাজচন্দ্র শিক্ষিত, সংযত, ধর্মপ্রাণ। মাঝে মাঝেই নৌকা করে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে যান। এইরকম এক নৌকাভ্রমণের সময় দূর থেকে কোনার ঘাটে সুন্দরী একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। জানবাজারে ফিরে এসে তাঁর ভালোলাগার কথা পরিজনদের জানালেন। ঘটকদের অনুসন্ধান শুরু হলো। খবর এল, কন্যাটির পিতা হরেকৃষ্ণ দাস। প্রীতিরাম তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। হরেকৃষ্ণ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। এমনও হয় নাকি!

কলকাতার সেরা ধনীর ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব। এ কোনো অলৌকিক ঘটনা! পৃথিবীর ঘটনা। তবু বলতে হয়, ছেলেবেলায়, যখন বয়েস আরো কম, রাসমণি ডুমুরের ফুল দেখেছিলেন, যা সাধারণত দেখা যায় না। তাঁর মা বলেছিলেন, 'সে কি রে? রানি! তুই তা হলে সত্য সত্যই রানি হবি!' তাঁর দেখা হলো না।

১৮০৪ সালে রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির বিবাহ হলো। সমারোহ, ধুমধাম। এ কি শুধু বিবাহ? প্রথমে তাই। শেষে ইতিহাস। তখন আর প্রীতিরাম, রাজচন্দ্র, জানবাজার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ও রানি রাসমণি। প্রীতিরামের জীবদ্দশায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির দুটি কন্যা হলো — পদ্মমণি ও কুমারী। ১৮১৩ সালে প্রীতিরাম জানবাজারের বর্তমান সুবৃহৎ পারিবারিক আবাস নির্মাণের কাজ শুরু করান। ১৮১৭ সালে চৌষট্টি বছর বয়সে প্রীতিরাম দাস পরলোকগমন করেন। সেই সময় স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা।

প্রীতিরামের সুযোগ্য পুত্র রাজচন্দ্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আধুনিক মনোভাবাপন্ন। কুসংস্কারমুক্ত উদার প্রকৃতির যুবক। পিতার ব্যবসা ও সম্পত্তির হাল ধরলেন। ইংলন্ডে কলভিন কাউই কোম্পানিকে এজেন্ট নিযুক্ত করে, তিনি এদেশ থেকে তসরের চাদর, মৃগনাভি, আফিং, নীল প্রভৃতি বিলেতে রপ্তানি করতে লাগলেন। প্রখর ব্যবসায়বুদ্ধি, সেইরকম উদ্যোগী। অবশ্যই ভাগ্যবান। একটি উদাহরণ, নিলামে পঁচিশ হাজার টাকার আফিং কিনে সেইদিনেই পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করে দিলেন। একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ। ক্রমশ, ক্রমশ ধন, জন, বিত্তবৈভব বাড়ছে। সকলেরই প্রত্যয়, ঘরে এসেছেন লক্ষ্মী। নাম তাঁর রাসমণি। রাজচন্দ্রের সুযোগ্য সহধর্মিণী।

পিতার পরলোকগমনের বছরেই রাসমণি পেলেন তাঁর তৃতীয়কন্যা করুণাময়ীকে। পরের বছরই বড়ো মেয়ের বিবাহ দিলেন। জানবাজারের এই মহৎ পরিবার ক্রমশই এক অদৃশ্য ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। সেখানে অর্থের সঙ্গে ধর্মের মহামিলন ঘটাবেন রানি রাসমণি। ১৮১৯ সালে রাসমণি একটি পুত্রসন্তান পেলেন, কিন্তু মৃত। চারবছর পরে এল কনিষ্ঠকন্যা জগদম্বা। পরবর্তীকালে এঁর ভূমিকাও ইতিহাসে চিহ্নিত হবে।

১৮৩১ সালে তৃতীয়কন্যা করুণাময়ী পরলোকগমন করলেন। রেখে গেলেন স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস ও একমাত্র পুত্র ভূপালচন্দ্রকে। এই মথুরামোহনও একদিন ইতিহাস হবেন। সেইদিন আসন্ন। ভবিষ্যতের সাজঘরে চরিত্ররা প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই কারণেই মথুরামোহন জানবাজার থেকে মুক্তি পেলেন না। ১৮৩৩ সালে রাজচন্দ্র কনিষ্ঠ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের বিবাহ দিলেন। এই মানুষটি নব্য বাংলার আলোকপ্রাপ্ত এক চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত।

রাজচন্দ্রের অনেক অবদান। প্রচুর উপার্জন, বিষয় সম্পত্তি, প্রচুর দান ধ্যান, সৎকার্যে অর্থব্যয়। তিনি দশ-বারোজন ছাত্রের সমস্ত খরচ চালাতেন। তাঁর দাম্পত্যজীবনে এসেছিল স্বর্গের সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা। স্ত্রীর অনুরোধে কলকাতার গঙ্গায় নির্মাণ করিয়ে দিলেন সুন্দর এক স্নানঘাট, যা আজ 'বাবুঘাট' নামে বিখ্যাত। দু'বছরের মধ্যে তৈরি করে দিলেন ঘাটে যাওয়ার সুন্দর একটি রাস্তা। পর পর হতে লাগল আরো জনহিতকর কাজ, বেলেঘাটার খাল খনন, নিমতলার পুরোনো ঘাট ও মুমূর্ষুনিবাস নির্মাণ, আহিরীটোলার ঘাট তৈরি, মেটকাফ হলে অর্থ সাহায্য, হিন্দু কলেজে ও দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে দান ইত্যাদি জনহিতকর কাজের জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৩ সালে রাজচন্দ্রকে 'রায়' উপাধি দিলেন। কিন্তু আর মাত্র তিনবছর। এই ব্রতধারী, কর্মময়, বদান্য সমাজসেবী মানুষটি পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন ১৮৩৬ সালে মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে। আর কি আশ্চর্য, ওই বছরই কামারপুকুরে এলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

এইবার প্রকাশিত হলো রাসমণির ব্যক্তিত্ব। শুধু জানবাজারে নয়, সমগ্র বঙ্গে শুরু হলো 'রাসমণি যুগ'। সেইকালে স্বামীর পারলৌকিক শ্রাদ্ধে খরচ করলেন ৫৫ হাজার টাকা। তারপর বিপুল সম্পত্তির দায়িত্বভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। অনেকেরই সন্দেহ, তিনি কি পারবেন! দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিপুল জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণ। একদিকে দুষ্ট জমিদারদের অভাব নেই, তাদের লেঠেল, খুনির দল, চোর-ডাকাত, দস্যু, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরেরা, সমাজের অজস্র সমস্যা, কৃষকদের শোচনীয় দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা। বিপন্ন বাংলা, বিপন্ন বাঙালি। নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। পুরুষশাসিত সমাজে তারা অর্ধমৃত। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সতীদাহ।

রাসমণির বিচক্ষণতা, ক্ষাত্রতেজ, দুর্দান্ত সাহস, কূটনৈতিক বুদ্ধি অচিরেই ঝলসে উঠবে। রাজচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে দু'লক্ষ টাকা ধার হিসেবে দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ সেই ধার শোধ করতে পারেননি। দ্বারকানাথ রানিমা'র কাছে এসেছেন। নানা কথার পর বললেন, 'তোমার এখন একজন ম্যানেজারের প্রয়োজন।'

পর্দার আড়ালে বসে রানিমা মথুরামোহনের মাধ্যমে দ্বারকানাথের সঙ্গে কথা আদান-প্রদান করছেন। রানিমা বললেন, 'রাখলে ভালো হয় ঠিকই কিন্তু তেমন বিশ্বাসী মানুষ পাব কোথায়?'

দ্বারকানাথ বললেন, 'তেমন হলে আমি তো আছি।'

ভয়ডরশূন্য রানিমা এইবার স্পষ্ট বললেন, 'সে তো খুব ভালো কথা, তবে আমি এখনো জানতে পারিনি যে, আমার স্বামীর কার কার কাছে কত টাকা পাওনা আছে। তবে আমার স্বামী আপনাকে যে দু-লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন, সেই টাকাটা যদি আপনি আমাকে এখন ফেরত দিতেন, তবে আমার বিশেষ উপকার হতো।'

সম্ভ্রান্ত দ্বারকানাথ স্তম্ভিত। তিনি যা ভেবেছিলেন এই পর্দানসীন মহিলা তো তা নয়। এঁর যে দেখি অসীম শক্তি। স্পষ্টবক্তা, দুর্দান্ত সাহসী। যেন বজ্র! দ্বারকানাথ খুবই বিব্রত বোধ করলেন। নগদ দু-লক্ষ টাকা তাঁর পক্ষে তখনই দেওয়া সম্ভব ছিল না। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তাঁর স্বরূপপুর পরগনাটি তিনি রাসমণির নামে লিখে দিলেন। সেইসময় এই পরগনার বার্ষিক আয় ছিল ৩৬ হাজার টাকা।

দ্বারকানাথ সেইসময় তাঁর নানা ব্যবসাপ্রচেষ্টায় মার খাচ্ছেন একের পর এক। বড়ো বড়ো সব ব্যাপার। তিনি আবার রানিমা'র কাছে ম্যানেজার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাসমণি জামাতা মথুরামোহনের মাধ্যমে জানালেন, 'আমি এক সামান্য বিধবা, আমার এই সামান্য বিষয়সম্পত্তি, আপনার মতো যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধান করতে বলাটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পুত্রস্থানীয় ভাবী উত্তরাধিকারী জামাতারাই এ কাজ পারবে।' দ্বারকানাথ পরে স্বীকার করেছিলেন, 'উত্তম বুঝলাম, এই রানি সামান্যা স্ত্রীলোক নন।'

সেকালের জমিদারদের খুব সুনাম ছিল না। নানা কায়দায় সম্পত্তি বাড়াতেন। নৃশংস পদ্ধতিতে খাজনা উসুল করতেন। রানিমা'র জমিদারির মধ্যে একটি তালুকের নাম ছিল জগন্নাথপুর। তালুকটির চারদিকেই নড়াইলের জমিদারের জমিদারি। সেইসময় নড়াইলের জমিদার, রামরতন রায়। তাঁর প্রবল ইচ্ছা, রাসমণির এই তালুকটি তিনি গ্রাস করবেন। তাঁর সুপরিকল্পিত অত্যাচারে জগন্নাথপুরের প্রজারা অতিষ্ঠ। লুটপাট, গৃহদাহ, নরহত্যা। আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাসমণির ওই তালুকের প্রজাদের নিজের বশে আনার চেষ্টা। রানির প্রচণ্ড প্রতাপের কাছে তাঁকে হার স্বীকার করতে হলো। প্রজাদের ওপর অত্যাচার রানি সহ্য করতে পারবেন কী করে? তিনি যে তাদের মা। তাঁর আদেশে 'মহাবীর' নামে এক সর্দারের নেতৃত্বে একদল লাঠিয়াল এল জগন্নাথপুরে প্রজাদের রক্ষার

জন্যে। মহাবীর মথুরবাবুর অত্যন্ত প্রিয় লাঠিয়াল। গম্ভীর প্রকৃতির, শক্তিশালী, সদাশয়। মহাবীরের আগমনে রামতরনের লেঠেলরা প্রথমে একটু পিছিয়ে গেলেও, পেছন থেকে অতর্কিত ছুরি চালিয়ে মহাবীরকে হত্যা করল।

রামরতন অনুমান করতে পারেননি জানবাজারের রানির শক্তি ও দৃঢ়তা কতটা। মহাবীরের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, হুগলি ও অন্যান্য জায়গা থেকে রানিমা বেছে বেছে লাঠিয়াল, পাইক, সড়কিওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করলেন। নেতৃত্বে জগন্নাথপুরের নায়েব। ওদিকে জমিদার রামরতন রায়ও দাঙ্গার জন্যে প্রস্তুত। রানিমার বাহিনীর কৃষ্ণকায় ভীষণাকার বলশালী যোদ্ধারা টাঙ্গি, বল্লম, বর্শা, লাঠি, সড়কি, কুঠার ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, 'জয় মায়ের জয়', 'জয় রানি রাসমণির জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। ওদিকে রানির নামে এই ভীষণ হুঙ্কারে বিপক্ষ স্তম্ভিত। রানিমায়ের নামমাহাত্ম্যেই দাঙ্গা আর হলো না। বহু লোকের প্রাণ বাঁচল।

এখনো হয়নি। রামরতনের এখনো কিছু পাওয়া বাকি আছে। রানিমা প্রতাপশালী এই জমিদারটির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করলেন। হার হলো রামরতনের। প্রজারা সুরক্ষিত হলেন। তাঁর জমিদারির মকিমপুর পরগনায় নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার শুরু হলো। অভাবনীয় অত্যাচারে পল্লিজীবন ছারখার। চাষের জমিতে ধানের পরিবর্তে গায়ের জোরে নীল বুনতে বাধ্য করা। ইংরেজের আদালতে ইংরেজদের সাতখুন মাপ। মকিমপুরে সবচেয়ে অত্যাচারী নীলকরের নাম ডোনাল্ড। একে টিট করার দাওয়াই লাঠি। আদালত কিছু করবে না। রানিমার লাঠিয়ালরা এসে ডোনাল্ডকে পিটিয়ে আধমরা করে দিলে। সাহেবরা আদালতে গেলেন। সুবিধে করতে পারলেন না। মামলা খারিজ হয়ে গেল। রানিমা তাঁর এলাকা থেকে সব নীলকরদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। কর্মচারীদের আদেশ দিলেন — কোনো চাষিই যেন কোনো কারণে কোনো সাহেবের কাছে জমি বিক্রি না করে।

পরে যা বিদ্রোহের আকার নেবে, 'বঙ্গে নীল বিদ্রোহ', তার সূচনা করেছিলেন বাংলার রানি রাসমণি। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর লাগাতার 'আইনি সংগ্রাম'। প্রজাস্বার্থবিরোধী কিছু করলেই প্রজারা দেখতেন, রানি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে রক্ষাকর্ত্রী। গঙ্গায় জেলেরা মাছ ধরতে চাইলে 'জলকর' দিতে হবে। প্রথমে দরিদ্র মৎস্যজীবীরা প্রতিকারের জন্য শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্য চাইলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকারকে ঘাঁটাবার সাহস কারো হলো না। তখন তাঁরা ভাবলেন, এই বিপদে আমাদের একজনই আছেন — রানিমা।

এবার আর লাঠি নয়, বুদ্ধি। রানিমা সরকারের কাছ থেকে জেলেরা গঙ্গার যে অংশে মাছ ধরে অর্থাৎ হাওড়ার ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত, দশ হাজার টাকায় ইজারা নিলেন। ইংরেজ সরকার টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। রানি রাসমণি টাকা দিয়েছেন। গঙ্গালিজ মঞ্জুর। এইবার আসল খেলা। রানিমা তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, লিজে নেওয়া গঙ্গার অংশটা এপাশে ওপাশে লোহার মোটা চেন দিয়ে ঘিরে দাও। ওই অংশটুকু আমার। গঙ্গাবন্ধনে সরকারের টনক নড়ল। জাহাজ, নৌকা চলাচল বন্ধ। রানিমা'র কৃপায় জেলেরা মনের আনন্দে মাছ ধরছেন।

সরকারের দপ্তর থেকে নোটিস এল, জলপথ কেন বন্ধ করা হয়েছে? কারণ দর্শাও। মাল চলাচলের অসুবিধে করে বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না কেন? রানিমার ভয়ডর নেই। লড়াই

করছেন সসাগরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। বুদ্ধির প্যাঁচ। নোটিস পেয়েও গঙ্গার চেন খুললেন না। সরকারকে জানালেন, 'আমি নির্ধারিত কর দিয়ে গঙ্গা জমা নিয়েছি, অতএব আইনত আমি ঐ পথ বন্ধ করতে পারি। আমার প্রজাদের অসুবিধা হচ্ছে। এই অংশে অনবরত জাহাজ চলাচল করলে, এবং কলকাতার বন্দরে জাহাজের ঘাঁটি হলে, এখানে গঙ্গায় জাহাজের শব্দের ভয়ে মাছ থাকবে না। প্রজাদের এই ক্ষতি এড়াবার জন্যই আমি এখানে জাহাজ আসতে দিতে পারি না।'

এই অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর সরকারের মাথা থেকে বেরলো না। তখন আপস। রানিমা বললেন, 'গঙ্গা জমা নেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। আমি শুধু গরিব জেলেদের মুখ চেয়েই এটি জমা নিয়ে কোনো কর ছাড়াই তাদের মাছ ধরতে দিতাম। সরকার যদি আগেকার মতো কর ছাড়াই আবার জেলেদের মাছ ধরতে দেন, তাহলে আমি পথ খুলে দিতে রাজি আছি।'

প্যাঁচে পড়ে সরকার 'জল কর' তুলে দিতে বাধ্য হলেন। রানিমার লিজের পুরো টাকা ফিরিয়ে দিলেন। গঙ্গা বন্ধন মুক্ত হলো। জেলেরা পেলেন করমুক্ত মাছ ধরার অধিকার, আজও যা বহাল আছে। সারা বাংলায় রানিমার নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সকলের মুখে মুখে একটি গান —

'ধন্য রানি রাসমণি রমণীর মণি।

বাংলায় ভালো যশ রাখিলে আপনি।।

দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।

দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী।

যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী।

ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনি।।'

জানবাজারের বিশাল সাতমহলা বাড়িতে খুব ঘটার দুর্গাপূজা। জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি রাজচন্দ্রই করিয়েছিলেন। জানবাজারের সম্পত্তি। সপ্তমীর সকালে ঢাকঢোল-সহযোগে পুরোহিতরা ওই পথ দিয়ে নবপত্রিকা স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশের একটি বাড়িতে এক সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চিৎকার করছেন, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট।' রানিমা এই প্রতিবাদে আদৌ বিচলিত না হয়ে নির্দেশ দিলেন, আমাদের ধর্ম, আমাদের বিধান। ধর্মে সাহেবি হস্তক্ষেপ! যা হচ্ছে তাই হবে, আরো বেশি হবে। তিনদিন ওই রাস্তায় ভোরবেলা প্রবল সোরগোল। আরো জোরে জোরে বাদ্যবাজনা। অপমানিত সাহেব রাসমণির বিরুদ্ধে মামলা করলেন। আদালতে রানিমা'র উকিল পেশ করলেন দলিল। গ্যারিসন অফিসারের মঞ্জুর করা দলিল। রাজচন্দ্র দাসকে রাস্তা করার জন্যে আর্মি ওই জমি দিয়েছিলেন। রাসমণি বলে পাঠালেন, 'আমার খাসের রাস্তা, আমার যা ইচ্ছা, আমি তাই করব। সরকার বাধা দিলে যে খরচে রাস্তা করিয়েছি তার দ্বিগুণ খরচে রাস্তা উচ্ছেদ করব।' তবুও সরকারি আদেশ অমান্য করার অপরাধে ৫০ টাকা জরিমানা।

রানিমা জরিমানা জমা দিলেন, তারপর, বড়ো বড়ো, মোটা মোটা গরান কাঠ দিয়ে জানবাজারের বাড়ি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত পুরো রাস্তার দুধার দৃঢ়ভাবে বেড়া দিয়ে আটকে দিলেন। অন্য রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। কি হচ্ছে বোঝার আগেই কাজ শেষ। রানিমার কর্মীরা এতটাই তৎপর, এবং তাঁদের সংখ্যা। ইংরেজ সরকার এইবার কী করবে করো। ইংরেজি ভাষারই প্রবাদ — 'টিট্ ফর ট্যাট্'। প্রথমে এল কড়া আদেশ, 'রাস্তা

খুলে দাও।' কড়া উত্তর, 'জায়গাটা আমাদের, রাস্তাটাও আমাদের তৈরি, বেড়াটাও আমাদের, সরকারের আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে আমার রাস্তা যদি সরকারের প্রয়োজন হয়, আমাকে উচিত মূল্য দিলে রাস্তা খুলে দোবো, নচেৎ নয়।'

সরকারের হম্বিতম্বি চুপসে গেল। এইবার অনুরোধ না চাইতেই জরিমানার টাকাও ফেরত এল। সরকার বুঝে গেলেন, এই নারীর শক্তি ও বুদ্ধিকে সমীহ করে চলতে হবে। একাই একশো। এঁর কাছে বারেবারে পরাজয়। রানি বাবুঘাটের রাস্তা নিজের খাসে রেখেও সাধারণের ব্যবহারের জন্যে বেড়া খুলে দিলেন। আবার তাঁর জয়জয়কার। তাঁর নামে এই ছড়াটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল —

'অষ্ট ঘোড়ার গাড়ি দৌড়ায় রানি রাসমণি।

রাস্তা বন্ধ করতে পারলে না কোম্পানি।।'

১৮৫৭ সাল। সিপাহি বিদ্রোহের কাল। ইংরেজদের নড়েচড়ে বসার কাল। বড়োসড়ো এক ধাক্কা। রানিমা রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি খুব ভালো বুঝতেন। তিনি জানতেন এদেশ থেকে ইংরেজদের সহজে হটানো যাবে না। তাদের রাজবুদ্ধি প্রবল। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে ক্যান্টনমেন্টে সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ সারা ভারতে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। বহু ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু, দমন-পীড়ন। এই সময় অনেকেই কোম্পানির কাগজ (শেয়ার) বিক্রি করে দিতে লাগলেন; কারণ ইংরেজ কোম্পানির আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। রানিমার পরামর্শদাতারা বললেন আপনিও এইবেলা সব শেয়ার বিক্রি করে দিন। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্না রাসমণির বদ্ধমূল ধারণা ছিল, এই বিক্ষিপ্ত এবং ধর্মীয় বিভ্রান্তিকর বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ কোনোমতেই ভারত ত্যাগ করে চলে যাবে না।

রানিমার ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হলো। বিদ্রোহ স্তিমিত হলো। কোম্পানির আমল শেষ হলো। ১৮৫৮ সাল ইংল্যান্ডেশ্বরী মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হলো। সমগ্র ভারতে কড়া শাসন। দেশের স্থানে স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে গোরা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এইরকম একটি সেনা ব্যারাক হলো রানিমার বাড়ির কাছে ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে। সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২০০/২৫০। বেশিরভাগই অশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ, অবাধ্য। মাথার ওপর একজন মাত্র অধিনায়ক — Officer Commanding। বিদ্রোহ শেষ। কিছুই যখন করার নেই এই দুশো, আড়াইশো বন্দুকধারী কী করবে? মাতাল অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে লোকজনের ওপর অত্যাচার, কখনো কখনো দোকানে, দোকানে, বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে অবাধ লুটপাট।

ঘটনাটা ঘটল এক সন্ধ্যায়। কয়েকজন মাতাল সৈন্য জানবাজারের পথে রানিমা'র বাড়ির সামনে এক নিরীহ পথচারীর ওপর অকারণে বলপ্রয়োগ করছিল। রাসমণিদেবীর দারোয়ানেরা তাদের বাধা দেয়। তারা তখন জোর করে রানিমার প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা করলে, দারোয়ানরা তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। একজন গোরা সৈন্যের মাথাও ফাটে। তারা এইবার ঘাঁটিতে গিয়ে প্রায় ৫০/৬০ জন উন্মত্ত সেনাকে নিয়ে ফিরে এল। হাতে খোলা তরোয়াল। শুরু হলো তাণ্ডব। দারোয়ানেরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তরোয়ালের আঘাতে দুজনের প্রাণ গেল। বাড়িতে সেই সময় পুরুষরা কেউ নেই।

গোরাদের তাণ্ডবের খবর পেয়ে রাসমণিদেবী বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির মেয়েদের ও শিশুদের মান্নাবাবুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। এইবার নিজে ধরলেন রণরঙ্গিণীর মূর্তি। হাতে ঝলসাচ্ছে খোলা

তরোয়াল। অন্দরমহলের গৃহদেবতা রঘুনাথজির মন্দিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। গৃহদেবতাকে জীবন বিসর্জন দিয়ে রক্ষা করবেন।

ওদিকে ভাঙচুর, লুটপাট চলেছে। বাড়ির পোষা পাখিগুলোকেও কেটে টুকরো টুকরো করেছে। বিশ্বস্ত ভৃত্য গোবিন্দের কোমরে তরোয়ালের কোপ মেরেছে। সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এরপর গোরা সৈন্যরা রাসমণিদেবীর ভৈরবী মূর্তির মুখোমুখি। কেউ কেউ মন্দিরের দিকে এগোবার চেষ্টা করলে রাসমণিদেবীর তরোয়ালের আঘাতে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এর পরে রাত দশটা নাগাদ জামাতা মথুরামোহন বাড়ি ফিরে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে স্থানীয় কলিঙ্গবাজারে গিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে গোরাদের ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের ডেরায় হাজির হলেন। তাদের অধিনায়ক ও আরো কিছু সৈনিককে নিয়ে জানবাজারের বাড়িতে এলেন। কম্যান্ডিং অফিসারের হুঙ্কারে সব শান্ত হলো। রাসমণিদেবী সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন।

এক জীবনে এত সৎকর্ম! বহুবিবাহ সেকালের সামাজিক ব্যাধি। এই কুলীন প্রথা বন্ধের জন্যে আন্দোলন চলছিল। রাসমণিদেবী এই আন্দোলনের পক্ষে তৎকালীন ব্যবস্থাপক সমাজে বহুবিবাহ রোধের একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের তালিকা দীর্ঘ। যেমন, সুবর্ণরেখা নদীর পরপার থেকে বহু অর্থব্যয়ে তীর্থযাত্রীদের জন্যে পুরী পর্যন্ত প্রশস্ত পথ তৈরি, জন্মস্থান কোনা গ্রামে একটি স্নানঘাট নির্মাণ, নিমতলা মহাশ্মশানে গঙ্গাযাত্রীদের জন্যে বহু টাকায় প্রাসাদতুল্য ঘাট নির্মাণ। আরো অনেক ঘাট — কালীঘাটের আদি গঙ্গায়, বাবুগঞ্জ। 'টোনার খাল' খনন করিয়ে মধুমতী নদীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগসাধন। বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন। বিভিন্ন কলেজে অর্থ সাহায্য।

সব কাজের সেরা কাজ, তিনি মন্দির হয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির। যে উদ্যানে ঘটবে বাংলার নবজাগরণ। সেই ভাবান্দোলনের প্রবাহ ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বিশ্বে। কালের ইতিহাসে তাঁর নাম জ্বলজ্বল করবে। ১৮৪৭ সাল, তিনি কাশী যাবেন। নৌবহর প্রস্তুত। তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন। কাশীতে কাশী থাক, এই গঙ্গার তীরে আমি তোমার পূজা নেবো। বারাণসী যাওয়ার জন্যে কলকাতার ঘাটে পঁচিশটি বজরা সুসজ্জিত ছিল। সেইসময় বঙ্গদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলে। রানিমার আদেশে বজরায় মজুত সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হলো।

রাসমণিদেবী জামাতা মথুরামোহনকে স্থান নির্বাচন ও দেবালয় নির্মাণের ভার অর্পণ করলেন। জমি পাওয়া গেল দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথী তীরে। সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বারুদাগারের দক্ষিণে, কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের এটর্নি জেমস হেস্টি সাহেবের দোতলা কুঠিবাড়িসমেত সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি ছিল। ৪২ হাজার ৫০০ টাকায় এই সম্পত্তি কেনা হলো। পূর্বদিকে কাশীনাথ চৌধুরিদের জমি, পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে সরকারি বারুদখানা, দক্ষিণে জেমস হেস্টির কারখানা। এই বিশাল উদ্যানটির পূর্ব মালিক ছিলেন জন হেস্টি। নাম ছিল 'সাহেবান বাগিচা'। তিনি কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এখানে একটি চটকল করবেন। কলের

যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিলেত যাওয়ার পথে জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হলো। জেমস হেস্টি তাঁর এটর্নি। রানীমা তাঁর কাছ থেকেই এই সম্পত্তি কিনলেন। মুসলমানদের কবরডাঙ্গা, গাজিপিরের স্থান, পুষ্করিণী, আমবাগান সবই ঢুকে গেল রানিমার সম্পত্তির মধ্যে। জমিটি 'কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি'। শাস্ত্রমতে শক্তিমন্দির প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম স্থান।

এই বিরাট বিষয়টি কেনা হলো ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। সেই বছরেই শুরু হলো মন্দির নির্মার্ণের কাজ দায়িত্বে তৎকালের নামকরা বিলিতি ঠিকাদারি সংস্থা 'ম্যাকিনটস অ্যান্ড বার্ন'। এই মন্দির নির্মাণে সময় লেগেছিল ৭/৮ বছর। নির্মাণকাজ শেষ হলো ১৮৫৪ সালে। অনেক শাস্ত্রীয় বাধা বেরিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো ১৮৫৫ সালের ৩১মে (১২৬২ বঙ্গাব্দ ১৮ জৈষ্ঠ্য, স্নান যাত্রার দিন)। বিরাট, বিপুল, অভাবনীয় সমারোহ। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, মূলাজোড়, নোয়াখালি, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, কাশী, পুরী, পুনা, মাদ্রাজ, কনৌজ, মিথিলা থেকে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন।

দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া যাবে না, কারণ রাসমণি ব্রাহ্মণ নন — এই ছিল সেকালের হিন্দুশাস্ত্রের ফরমান। স্বপ্নাদিষ্ট রানিমাতা এই বিধান মানবেন কেন? মন্দির নির্মাণের শুরুর দিন থেকে তিনি ব্রতধারী। তাপসীর জীবন ধারণ করেছেন। কঠোর নিয়মে-নিষ্ঠায় নিজেকে বেঁধেছেন। শেষমুহূর্তে সমাধানের পথ বের করে দিলেন কামারপুকুরের পন্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। প্রতিষ্ঠার দিন রামকুমারই দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করলেন। রানি রাসমণি মহানন্দে, পরম উৎসাহে 'অন্নদানযজ্ঞ' করলেন। সেই আয়োজন কেউ কখনো শোনেনি, দেখা তো দূরের কথা। যেমন, দধি-পুষ্করিণী, পায়েস-সমুদ্র, ক্ষীরহ্রদ, দুগ্ধ-সাগর, তৈল-সরোবর, ঘৃত-কূপ, লুচি-পাহাড়, মিষ্টান্ন-স্তূপ, কদলীপত্র-রাশি, মৃন্ময়পাত্র-স্তূপ। সেই কালে মোট ন'লক্ষ টাকা খরচ হলো।

মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন থেকেই শুরু হয়েছিল নানা উৎসব — যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণ গান। উৎসবের দিন দাদা রামকুমারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে উৎসব-রাত্রির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বিরামহীন আনন্দ। অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিনের মতো উজ্জ্বল, রানি যেন রজতগিরি তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন।

এই মন্দির, মন্দির সংলগ্ন উদ্যানের পঞ্চবটীতে শুরু হবে আর কয়েকদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের যুগান্তকারী সাধনা, 'যত মত তত পথ'। ইংরিজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত উচ্চবংশীয় একদল যুবক সাধক, অবতার পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই দেবালয়ে আসবেন। এই তপোভূমি থেকেই উদিত হবেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করবেন ভারতধর্ম। প্রবক্তা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। এই মন্দির সব কর্মকাণ্ডকে ম্লান করে দিয়ে হয়ে উঠবে অনির্বাণ এক শিখা। দক্ষিণেশ্বর, মা কালী, রানি রাসমণি, মথুরামোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত সংযোগ। কি না হবে এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে! রানিমাতার অন্যতম জীবনীকার শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন লিখলেন, 'দক্ষিণেশ্বর নিত্যতীর্থ, ব্যক্ততীর্থ, শুধু ভারতের নয়, জগতের মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। লোকমাতা শ্রীশ্রীরানি রাসমণি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব যুগান্তকারী ব্যাপার। রানিমা যুগদেবীস্বরূপে

ও ঠাকুর যুগাবতার-স্বরূপে আসিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উভয়েই দিব্যলীলার মাধুর্য প্রকট করিলেন... ঠাকুর বলিতেন রানিমা বিশ্বজননী জগদম্বা। ধরাধামে তাঁহার লীলা বিস্তার করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের পক্ষে গোপীনাথ দাস লিখছেন, 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রানি বিশেষভাবে ধর্ম-কর্ম ও পূজার্চনা নিয়েই দিন কাটাতেন। জমিদারি দেখাশোনার ভার জামাতাদের। জানবাজারের বাড়িতে বেশি থাকতেন না। অধিকাংশ সময়েই কখনো একা, কখনো বা সপরিবারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেই কাটাতেন।

'দাদার পরলোকগমনের পর (তিনি মাত্র এগারো মাস এই নতুন মন্দিরে পুজারির দায়িত্ব সামলেছিলেন) রামকৃষ্ণদেব পূজারি হলেও রানিমা রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে অসাধারণ ধর্মভাব দেখে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, নিকটে বসে ধর্মকথা শুনতেন। অনেক সময় আবার রামকৃষ্ণদেবের মুখে ভজন ও অন্যান্য ধর্মসংগীত শুনতেন। রামকৃষ্ণদেব রানির মধ্যে অপরিসীম ধর্মভাব দেখে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, 'রানিমা দেবীর অষ্ট সখীর একজন।'

জমজমাট একটি জীবন। কর্মে, ধর্মে, সেবায়, জনহিতে সম্পূর্ণ নিবেদিত এক প্রাণ। এইবার বুঝি যাওয়ার সময় হলো। সবটা দেখা হলো না। দক্ষিণেশ্বর রইল, রইলেন মা ভবতারিণী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে, রইল রূপোর রথ, সবই হবে যেমন হতো দোল দুর্গোৎসব। থাকবেন না রানি রাসমণি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ সাল (১২৬৭ বঙ্গাব্দ, ৯ ফাল্গুন), রাত্রে কালীঘাটের বাগানবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাষমণি দাসি'। এই ছিল তাঁর সিলমোহর — RAUS MONEY DOSSI/কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাষমণী দাসি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬) : একালের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। শৈশব কেটেছে ছোটনাগপুরের নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে। কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। সরকারি চাকরিতেও ছিলেন কিছুকাল। তারপর পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন সাংবাদিকতাকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সারি সারি মুখ'। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ', 'শ্বেতপাথরের টেবিল', 'পায়রা', 'সোফা-কাম-বেড', 'শাখা-প্রশাখা', 'তৃতীয় ব্যক্তি', 'শঙ্খচিল', 'বুদবুদ', 'অবশেষ', 'দুই-মামা', 'নবেন্দুর দলবল', 'মনোময়', 'অজ্ঞাতবাস', 'ইতি পলাশ', 'ইতি তোমার মা', 'কলকাতার নিশাচর', 'ডোরাকাটা জামা', 'বুকুসুকু', 'শিউলি' প্রভৃতি। 'গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ', 'দীনজনে', 'পরমপদকমলে', 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ চরণকমলে' প্রভৃতি তাঁর লেখা ভিন্নস্বাদের কয়েকটি বই।

হারিয়ে যাওয়া কালি কলম

শ্রীপান্থ

কথায় বলে— কালি কলম মন, লেখে তিন জন। কিন্তু কলম কোথায়? আমি যেখানে কাজ করি সেটা লেখালেখির আপিস। সবাই এখানে লেখক। কিন্তু আমি ছাড়া কারও হাতে কলম নেই। সকলের সামনেই চৌকো আয়নার মতো একটা কাচের স্ক্রিন বা পরদা। আর তার নীচে টাইপরাইটারদের মতো একটা কি-বোর্ড। প্রতিটি বোতামে ছাপা রয়েছে একটি করে হরফ। লেখকরা অনবরত তা দিয়ে লিখে চলেছেন, মাঝে মাঝে লেখা থামিয়ে তাকাচ্ছেন সেই পরদার দিকে। যা ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে তা-ই ফুটে উঠেছে পরদায়। আমি যা লিখি ওঁরা ভালোবেসে আমার লেখাকেও এভাবে ছাপার জন্য তৈরি করে দেন। একদিন যদি কোনও কারণে কলম নিয়ে যেতে ভুলে যাই তবেই বিপদ।—কলম! কারও সঙ্গে কলম নেই। যদি বা কারও কাছে গলা-শুকনো ভোঁতা-মুখ একখানা জোটে, তবে তাতে লিখে আমার সুখ নেই। দায়সারা ভাবে কোনও মতে সেদিনকার মতো কাজ সারতে হয়। অথচ আমাদের আপিস, সবাই বলেন, লেখালেখির অফিস। লেখকের কারখানা। বাংলায় একটা কথা চালু ছিল, 'কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি'! কালগুণে বুঝিবা আজ আমরাও তা-ই।

আমি গ্রামের ছেলে। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমার মতো যাঁরা বাংলার অজ-পাড়া-গাঁয়ে জন্মেছেন তাঁরা হয়তো বুঝবেন কলমের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা কলম তৈরি করতাম রোগা বাঁশের কঞ্চি কেটে। মুশকিল হতো কলমের মুখটি চিরে দেওয়ার সময়। বড়োরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কলম শুধু সুঁচলো হলে চলবে না, কালি যাতে এক সঙ্গে গড়িয়ে না-পড়ে তার জন্য মুখটা চিরে দেওয়া চাই। তবে কালি পড়বে ধীরে ধীরে চুইয়ে। কোথায় পড়বে? না, লেখার পাতে। লেখার পাত বলতে শৈশবে আমাদের ছিল কলাপাতা। তাই কেটে কাগজের মতো সাইজ করে নিয়ে আমরা তাতে 'হোম-টাস্ক' করতাম। আর সেগুলি বান্ডিল করে নিয়ে যেতাম স্কুলে। মাস্টারমশাই দেখে বুঝে আড়াআড়ি ভাবে একটা টানে তা ছিঁড়ে ফেরত দিতেন পড়ুয়াদের। আমরা ফেরার পথে কোনও পুকুরে তা ফেলে দিয়ে আসতাম। বাইরে ফেললে গোরু খেয়ে নিলে অমঙ্গল। অক্ষরজ্ঞানহীনকে লোকে বলে, ওর কাছে ক'অক্ষর গোমাংস। গোরুকে অক্ষর খাওয়ানোও নাকি পাপ।

আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই। অবশ্য মা পিসি দিদিরাও সাহায্য করতেন। প্রাচীনেরা বলতেন— 'তিল ত্রিফলা সিমুল ছালা/ছাগ দুগ্ধে করি মেলা/লৌহপাত্রে লোহায় ঘসি/ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।' ভালো কালি তৈরি করতে হলে এই ছিল তাঁদের ব্যবস্থাপত্র। আমরা এত কিছু আয়োজন কোথায় পাব। আমাদের ছিল সহজ কালি তৈরি পদ্ধতি। বাড়ির রান্না হতো কাঠের উনুনে। তাতে কড়াইয়ের তলায় বেশ কালি জমত। লাউপাতা দিয়ে তা ঘষে তুলে একটা পাথরের বাটিতে রাখা জলে তা গুলে নিতে হতো। আমাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা ওই কালো জলে হরতকী ঘষত। কখনও কখনও মাকে দিয়ে আতপ চাল ভেজে পুড়িয়ে তা বেটে ওতে মিশাত। সব ভালো করে মেশাবার পর একটা খুন্তির গোড়ার দিকটা পুড়িয়ে লাল টকটক করে সেই জলে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো। অল্প জল তো, তাই অনেক সময় টগবগ করে ফুটত। তারপর ন্যাকড়ায় ছেঁকে দোয়াতে ঢেলে কালি। দোয়াত মানে মাটির দোয়াত। বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর কলাপাতা, বলতে গেলে তাই নিয়ে আমাদের প্রথম লেখালেখি। এত বছর পরে সেই কলম যখন হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম, তখন মনে কষ্ট হয় বইকী!

ভাবি, আচ্ছা, আমি যদি জিশু খ্রিস্টের আগে জন্মাতাম! যদি ভারতে জন্ম না হয়ে আমার জন্ম হত প্রাচীন মিশরে? আমি যদি বাঙালি না হয়ে হতাম প্রাচীন সুমেরিয়ান বা ফিনিসিয়ান? তবে হয়তো নীল নদীর তীর থেকে একটা নল-খাগড়া ভেঙে নিয়ে আসতাম, সেটিকে ভোঁতা করে তুলি বানিয়ে লিখতাম। হয়তো সুঁচালো করে কলম বানাতাম। হয়তো ফিনিসীয় আমি, বনপ্রান্ত থেকে কুড়িয়ে নিতাম একটা হাড়— সেই আমার কলম। এমনকী আমি যদি রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতাম, আমি যদি হতাম স্বয়ং জুলিয়াস সিজার, তা হলেও আমার শ্রেষ্ঠ কারিগররা বড়োজোড় একটা ব্রোঞ্জের শলাকা, যার পোশাকি নাম স্টাইলাস, তুলে দিত আমার হাতে, তার বেশি কিছু নয়। সিজার যে কলমটি দিয়ে কাসকাকে আঘাত করেছিলেন সেটি কিন্তু এই স্টাইলাস বা ব্রোঞ্জের ধারালো শলাকা। কলম সেদিন খুনিও হতে পারে বইকী। চিনারা অবশ্য চিরকালই লিখে আসছে তুলিতে। তাদের বাদ দিলে এই সেদিন পর্যন্ত বিশ্বের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা ছিল সর্বার্থেই শলাকা। তা বাঁশের হোক, নল-খাগড়ার হোক, পাখির পালক আর ব্রোঞ্জেরই হোক।

এখন স্কুলের ছেলেমেয়ের তহবিলেও হয়তো দেখা যায় রকমারি কলম। হয়তো গ্রামাঞ্চলেও আজ বাঁশের কঞ্চির কলম আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খাগের কলম দেখা যায় একমাত্র সরস্বতী পুজোর সময়। কাচের দোয়াতে কালির বদলে দুধ। ফাউন্টেন পেন বা বলপেনের বদলে খাগের কলম। পালকের কলমও আর চোখে

পড়ে না। তার ইংরেজি নাম ‘কুইল’। লর্ড কার্জন বাঙালি সাংবাদিকদের গরম গরম ইংরেজি দেখে তাঁদের বলতেন— ‘বাবু কুইল ড্রাইভারস’। এখন পালকের কলম দেখতে হলে পুরানো দিনের তৈলচিত্র কিংবা ফটোগ্রাফ ছাড়া গতি নেই।

উইলিয়াম জোন্স কিংবা কেরি সাহেবের স-মুনশি ছবিতে দেখা যায় সামনে তাঁদের দোয়াতে গোঁজা পালকের কলম। এই পালক কেটে কলম তৈরির জন্য সাহেবরা ছোট্ট একটা যন্ত্রও বের করেছিলেন। যন্ত্রটা এক ধরনের পেনসিল সার্পনারের মতো। তাতেও রয়েছে ধারালো ব্লেড। পালক ঢুকিয়ে চাপ দিলেই ব্যস, তৈরি হয়ে গেল কলম।

পালকের কলম তো দূরস্থান, দোয়াত কলমই বা আজ কোথায়! কোনও কোনও আপিসে দেখা যায় টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে দোয়াত কলম। কিন্তু সে সব ফাঁকি মাত্র। ওই কলম দুটি আসলে ছদ্মবেশী বল-পেন মাত্র। তাকে আবার কেউ কেউ বলেন ডট-পেন। কিছুকাল আগে একজন বিদেশি সাংবাদিক লিখেছিলেন কলকাতার চৌরঙ্গির পথে গিজগিজ করছে ফেরিওয়ালা। তাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের পেশা কলম বিক্রি। এক হাতে দশ কলমধারী ফেরিওয়ালা কিন্তু এখনও দেখা যায়। শস্তার চূড়ান্ত। ফলে প্রত্যেকের পকেটে কলম। শুধু কি পকেটে? পণ্ডিত মশাইয়ের কলম খ্যাত ছিল কানে গুঁজে রাখার জন্য। দার্শনিক তাঁকেই বলি— যিনি কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজেন।

ছেলেবেলায় একজন দারোগাবাবুকে দেখেছিলাম যাঁর কলম ছিল পায়ের মোজায় গোঁজা। আজকাল কোনও কোনও অতি-আধুনিক ছেলেকে দেখি যাদের কলম বুক-পকেটে নয়, কাঁধের ছোট্ট পকেটে সাজানো। কেউ কেউ অবশ্য চুলেও কলম ধারণ করেন। সেটা অবশ্য ইচ্ছাকৃত নয়, ভিড়ের ট্রামে বাসে যাতায়াতের ফল। মহিলা যাত্রী ট্রাম থেকে নামছেন, কে একজন চেঁচিয়ে উঠল,— ও দিদি, আপনার খোঁপায় কলম।

বিস্ফোরণ। কলম বিস্ফোরণ। এক সময় বলা হতো— ‘কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফেতে রাজপুত।’ এখন কলম বা গোঁফ, কোনও কিছুই আর বিশেষ কারও নয়। ‘কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।’ এখনকার পেটে কত অক্ষর তা নিয়ে যাঁদের ভাবনা তাঁরা ভাবুন। আমরা শুধু জানি দেশে সবাই সাক্ষর না হলেও, কলম এখন সর্বজনীন। সত্যি বলতে কী, কলম এখন এতই শস্তা এবং এতই সর্বভোগ্য হয়ে গেছে যে, পকেটমাররাও এখন আর কলম নিয়ে হাতসাফাইয়ের খেলা দেখায় না। কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।

পণ্ডিতরা বলেন কলমের দুনিয়ায় যা সত্যিকারের বিপ্লব ঘটায় তা ফাউন্টেন পেন। এক কালে বাংলায় তাকে বলা হতো ঝরনা কলম। নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়াও হতে পারে।

একদিন অফুরন্ত এই কালির ফোয়ারা যিনি খুলে দিয়েছিলেন তার নাম—লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান। সেকালের আরও অনেক ব্যবসায়ীর মতো তিনি দোয়াত কলম নিয়ে কাজে বের হতেন। একবার গিয়েছেন আর একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করতে। দলিল কিছুটা লেখা হয়েছে এমন সময় দোয়াত হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে গেল কাগজে। আবার তিনি ছুটলেন কালির সন্ধানে। ফিরে এসে শোনেন, ইতিমধ্যে আর একজন তৎপর ব্যবসায়ী সইসাবুদ সাঙ্গ করে চুক্তিপত্র পাকা করে চলে গেছেন। বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন— আর নয়, এর একটা বিহিত তাঁকে করতেই হবে। জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন।

আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের একটা নামী দোকানে গিয়েছি একটা ফাউন্টেন পেন কিনব বলে। দোকানি জানতে চান, কী

কলম। বাস, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তিনি আউড়ে চলেছেন,— পার্কার? শেফার্ড? ওয়াটারম্যান? সোয়ান? পাইলট? কোনটার কী দাম সঙ্গে সঙ্গে তা-ও তিনি মুখস্থ বলতে লাগলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন আমার পকেটের অবস্থা।— তবে হ্যাঁ, শস্তার একটা পাইলট নিয়ে যাও। জাপানি কলম। কিন্তু দারুণ। বলেই মুখ থেকে খাপটা সরিয়ে ধাঁ করে কলমটা ছুড়ে দিলেন টেবিলের এক পাশে দাঁড়-করানো একটা কাঠের বোর্ডের উপর। সার্কাসে খেলোয়াড় যেমন একজন জ্যান্ত মানুষকে বোর্ডের গায়ে দাঁড় করিয়ে ধারালো ছুরি ছুড়ে দেয় তার দিকে, ভঙ্গিটি ঠিক সে-রকম। সার্কাসের খেলায় লোকটি শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকে। আমাকে অবাক করে তিনি কলমটি বোর্ড থেকে খুলে নিয়ে দেখালেন,— এই দেখো। নিব ঠিক আছে। দু'এক ছত্র লিখে দেখিয়ে দিলেন। আমি সেদিন সেই জাদু-পাইলট নিয়েই ঘরে ফিরেছিলাম। পরে নামী দামি আরও নানা নামের নানা জাতের ফাউন্টেন পেন হাতে এসেছে। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম সেই জাপানি পাইলটকে। ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ, তা লেখককে নেশাগ্রস্ত করে। অবশ্য যদি পয়সাওয়ালা লেখক হন। বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ একবার আমাকে দেখিয়েছিলেন তাঁর ফাউন্টেন সংগ্রহ।— ডজন-দু'য়েক তো হবেই। পার্কারই ছিল বেশ কয়েক রকম। শৈলজানন্দ বলেছিলেন, এই নেশা পেয়েছি আমি শরৎদার কাছ থেকে। হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরও ছিল ফাউন্টেন পেনের নেশা।

আদিতে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল 'রিজার্ভার পেন'। ওয়াটারম্যান তাকেই অনেক উন্নত করে তৈরি করেছিলেন ফাউন্টেন পেন। আমাদের ঝরনা কলম। গাঁয়ের ছেলে আমি অবশ্য ফাউন্টেন পেন হাতে তুলে নিয়েছি অনেক পরে। আমি ছিলাম কালি কলমের ভক্ত। অর্থাৎ, দোয়াত আর নিবের কলমের। বাঁশের বা কঞ্চির কলমকে ছুটি দিই শহরে হাইস্কুলে ভর্তির পর। কালি বানানোও বন্ধ তখন। কাচের দোয়াতে আমরা কালি বানাতাম কালি ট্যাবলেট বা বড়ি-গুলি দিয়ে। লাল নীল দু'রকম বড়িই পাওয়া যেত। অবশ্য তৈরি কালিও পাওয়া যেত দোয়াতে এবং বোতলে। তাদের বাহারি সব নাম, কাজল কালি, সুলেখা ইত্যাদি। বিদেশি কালিও পাওয়া যেত। তবে তা প্রধানত ফাউন্টেন পেনের জন্য। নিব এবং হ্যান্ডেলও ছিল রকমারি। সুচালো মুখের নিবের মতো ছিল চওড়া মুখের নিব, যার যেমনটি চাই। হ্যাঁ, বিদেশে উন্নত ধরনের নিবও বের হয়ে ছিল একসময়। সে সব গোরুর শিং নয়তো কচ্ছপের খোল কেটে তৈরি। খুবই টেকসই। পালকের কলম তাড়াতাড়ি ভোঁতা হয়ে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। কখনও বা শিংয়ের নিবের মুখে বসানো হতো হিরে। ফাউন্টেন পেনের প্লাটিনাম, সোনা— এসব দিয়ে মুড়ে তাকে আরও দামি, আরও পোক্ত করা হতো। এসব করে রকমারি চেহারার শস্তা দামি ফাউন্টেন পেন বাজারে ছেড়ে ক্রমে হঠিয়ে দেওয়া হলো দোয়াত আর কলমকে। আমরা যখন কলেজে পড়ছি তখন বলতে গেলে সব পড়ুয়ার পকেটেই ফাউন্টেন পেন। কঞ্চির কলম, খাগের কলম, পালকের কলম সব উধাও। সেই সঙ্গে শিক্ষিত ঘরে, কিংবা অফিসে আদালতে টেবিল থেকে উধাও জোড়া দোয়াত কলম— সেগুলো সাজিয়ে রাখার আসবাব। কালির আধার, ব্লটিং-পেপার সব। এক সময় লেখা শুকানো হতো বালি দিয়ে। পরে ব্লটিং পেপারে। সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান।

দোয়াত যে কত রকমের হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাচের, কাট-গ্লাসের, পোর্সেলিনের, শ্বেতপাথরের, জেডের, পিতলের, ব্রোঞ্জের, ভেড়ার শিংয়ের, এমনকী সোনারও। গ্রামে কেউ দু'একটা পাশ দিতে পারলে বুড়ো-বুড়িরা আশীর্বাদ করতেন— বেঁচে থাকো বাছা, তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক। সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো; তা জেনেছিলাম সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে।

সাহিত্য এবং ইতিহাসের নানা চরিত্র পর্যন্ত যোগ করা ছিল কোনও কোনও দোয়াতে। অবাক হয়ে সেদিন মনে মনে ভাবছিলাম, এই সব দোয়াতের কালি দিয়েই না শেক্সপিয়ার, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র সব অমর রচনা লিখে গেছেন। হায়, কোথায় গেল সে সব দিন। এখন ফাউন্টেন পেন! ক্রমে তা-ও বুঝিবা যায় যায়। এখন বল-পেন বা ডট পেন। এক রোগা লিকলিকে রিফিলে কে কত দূর দৌড়াতে পারে তা নিয়ে তার গর্ব। ফাউন্টেন পেনও অবশ্য কম যায় না। একটা বিদেশি কাগজে ফাউন্টেনের বিজ্ঞাপনে দেখছিলাম ওঁদের তহবিলে নাকি রয়েছে সাতশো রকম নিব। যাঁরা গান চর্চা করেন তাঁদের জন্য, যাঁরা শ্রুতিলেখক বা স্টেনোগ্রাফার তাঁদের জন্য, যাঁরা বাঁ হাতে লেখেন তাঁদের জন্য, এক কথায় সব ধরনের লেখকের জন্য আলাদা আলাদা নিব। যন্ত্রযুগ সকলের দাবি মেটাতেই তৈরি। হ্যাঁ, টাকার কুমিরদের খুশি করারও ব্যবস্থা তাঁদের হাতে। একটি কলমের দাম ধার্য হয়েছে আড়াই হাজার পাউন্ড (এক পাউন্ড সমান পঁচাত্তর টাকা, হিসাব করে দেখো কত টাকা!) সে কলমের সোনার অঙ্গ, হিরের হৃদয়। সোনায় গড়া হিরে বসানো জড়োয়া কলমের দাম তো হবেই। দামি বল পয়েন্টও আছে বটে।

আশ্চর্য, সবই আজ অবলুপ্তির পথে। কমপিউটার তাদের জাদুঘরে পাঠাবে বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে। ফলে আমার মতো আরও কেউ কেউ নিশ্চয় বিপন্ন বোধ করছেন। মানুষের হাত থেকে যদি কেড়ে নেওয়া হয় কলম, যদি হাতের লেখা মুছে যায় চিরকালের জন্য তবে কী আর রইল? বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে'। কলমের দিনও কি ফুরালো? হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে ঠাঁই কিন্তু তার পাকা। যাঁরা ওস্তাদ কলমবাজ তাঁদের বলা হলো 'ক্যালিগ্রাফিস্ট' বা লিপি-কুশলী। মুঘল দরবারে একদিন তাঁদের কত না খাতির, কত না সম্মান! শুধু মুঘল কেন, বিশ্বময় সব দরবারেই। আমাদের এই বাংলা-মুলুকেও রাজা জমিদাররা লিপি-কুশলীদের গুণী বলে সম্মান করতেন, তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ গৃহস্থও লিপিকরদের ডেকে পুথি নকল করাতেন। এখনও পুথি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ''সমানি সম শীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।'' সব অক্ষর সমান, প্রতিটি ছত্র সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন। এক এক জনের যাকে বলে— মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর। অথচ কত সামান্যই না রোজগার করতেন ওঁরা।

চারখণ্ড রামায়ণ কপি করে একজন লেখক অষ্টাদশ শতকে পেয়েছিলেন নগদ সাত টাকা, কিছু কাপড় আর মিঠাই। এক সাহেব লিখে গেছেন উনিশ শতকে বারো আনায় বত্রিশ হাজার অক্ষর লেখানো যেত। তবু পুথির কত না মাহাত্ম্য। তাকে ঘিরে লিপিকরের কত না গর্ব। অনেক পুথিরই— খবরদার! এ পুথি যেন কেউ চুরি করার চেষ্টা না করে।

কলমকে বলা হয় তলোয়ারের চেয়েও শক্তিধর। ফাউন্টেন পেনও হয়তো আভাসে ইঙ্গিতে তা-ই বলতে চায়। কেননা, অনুষঙ্গ হিসাবে 'ব্যারেল' 'কার্টিজ' এসব শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কদাচিৎ বারুদের গন্ধ কানে পৌঁছায়। অন্যদিকে ইতিহাসে কিন্তু অনেক পালকের কলমধারীকে সত্যই কখনও কখনও তলোয়ার হাতে লড়াই করতে হয়েছে ক্রূর কিংবা মিথ্যাচারী প্রতিপক্ষের সঙ্গে। কলকাতার ইতিহাসেও এ ধরনের 'ডুয়েল' বা দ্বৈরথের কাহিনি রয়েছে। সুতরাং, যখন দেখি এত পরিবর্তনের মধ্যেও কেউ কলম আঁকড়ে পড়ে আছেন তখন বেশ ভালো লাগে। ভাবতে ভালো লাগে আমাদের কালের অধিকাংশ লেখকই এখনও কলমে লেখেন। অনেক ধরে ধরে টাইপ-রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন। তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। গত ক'বছর ধরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও টাইপ-রাইটার ধরেছেন। অন্যরা প্রায় সবাই লিখছেন কলমে। অবশ্য ফাউন্টেন পেন কিংবা

বল-পেনে। সম্ভবত শেষ পর্যন্ত নিবের কলমের মান মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন একমাত্র সত্যজিৎ রায়। তাঁর অনেক সুস্থ সুন্দর নেশার একটি ছিল লিপিশিল্প। তাঁর হাতের লেখার কুশলতার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পকর্মের সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব। কে না জানেন, রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়সে যে চিত্রশিল্পী হিসাবে বিশ্বময় সম্মানিত হয়েছিলেন, তার সূচনা কিন্তু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির পাতায়। অক্ষর কাটাকুটি করতে গিয়ে আনমনে রচিত হয়েছিল ছন্দোবন্ধ সাদা-কালো ছবি। কমপিউটারও নাকি ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু সে ছবি কতখানি যন্ত্রের, আর কতখানি শিল্পীর?

আমি কালি-খেকো কলমের ভক্ত বটে, কিন্তু তাই বলে ফাউন্টেন পেন বা বল-পেনের সঙ্গে আমার কোনও বিবাদ নেই। কেননা, ইতিমধ্যেই বল-পেনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি আমি। মনে মনে সেই ফরাসি কবির মতো বলেছি— ‘তুমি সবল, আমি দুর্বল। তুমি সাহসী, আমি ভীরু। তবু যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, আচ্ছা, তবে তা-ই হোক। ধরে নাও আমি মৃত।’

হ্যাঁ, একবার অন্তত নিবের কলমকে দেখা গেছে খুনির ভূমিকায়। অসাধারণ লেখক, তোমার আমার সকলের প্রিয় ‘কঙ্কাবতী’ ‘ডমরুধর’-এর স্বনামধন্য লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মারা গিয়েছিলেন নিজের হাতের কলম হঠাৎ অসাবধানতাবশত বুকে ফুটে গিয়ে। সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তাঁর মৃত্যু।

(সম্পাদিত)

শ্রীপান্থ (১৯৩২—২০০৪) : লেখাপড়া ময়মনসিংহ আর কলকাতায়। প্রকৃত নাম নিখিল সরকার, শ্রীপান্থ তাঁর ছদ্মনাম। তরুণ বয়স থেকেই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। চাকরি করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন গভীর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি। ‘দেবদাসী’, ‘ঠগী’, ‘হারেম’ ইত্যাদি বইয়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিষয়ক বইগুলিও— ‘আজব নগরী’, ‘শ্রীপান্থের কলকাতা’, ‘যখন ছাপাখানা এলো’, ‘মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ’, ‘কেয়াবাৎ মেয়ে’, ‘মেটিয়াবুরুজের নবাব’, ‘বটতলা’, ‘কলকাতা’। বাংলা মুলুকে প্রথম ধাতব হরফে ছাপা বই হ্যালহেডের ‘আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ’-এর সাম্প্রতিক একটি সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকা তিনি লিখেছেন।

ভারতবাসীর আহার

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আর পাঁচটা বিষয়ে যেমন, অশনভূষণেও ভারতবর্ষ বিচিত্র বিভিন্নতার দেশ— যদিও এই বিভিন্নতার মধ্যেও একটা অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের একতা আছে। প্রাকৃতিক আবেষ্টনী জলবায়ু, খাদ্যবস্তুর সমাবেশ, এ সব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে, পাঞ্জাব, উত্তর-ভারত, বাংলা, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারত, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের খাবার আলাদা আলাদা ধরনের। ইউরোপে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধরে সমগ্র মহাদেশটাকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে — অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা উত্তর ইউরোপ, আর তার চেয়ে গরম দক্ষিণ ইউরোপ। উত্তর

ইউরোপে লোকে বেশি করে গোরু পোষে। ও অঞ্চলে মাখনটাই সাধারণত ওরা বেশি করে খায়, মাখন দিয়ে (আর অভাবে শূওরের চর্বি দিয়ে) ভাজা বস্তুই বেশি প্রচলিত, আর তা ছাড়া, পানীয় হিসাবে যব থেকে তৈরি বিয়ার মদ উত্তরের দেশে বেশি খায়। দক্ষিণ ইউরোপ হচ্ছে ছাগলের দেশ, আর ঐ অঞ্চলে জলপাই গাছ খুবই হয়। জলপাইয়ের তেল সাধারণত রান্নায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে; আঙুরও ফলে অজস্র, সেইজন্য আঙুরের রসে তৈরি মদ সকলেই খায়। খাবারের এই রকমফের দেখে, উত্তর ইউরোপের সম্বন্ধে বলা হয় Beer and Butter

Area, আর দক্ষিণ ইউরোপের সম্বন্ধে Wine and Olive Oil Area। ভারতবর্ষকে মোটামুটি এই ধরনে ভাগ করা যেতে পারে— পাঞ্জাব, উত্তর ভারত, মহারাষ্ট্রের শুখনো অঞ্চল, আর সমুদ্রের উপকূলের বর্ষার দেশ; আর সাধারণ খাওয়া ধরে উত্তর অঞ্চলের নাম করা যায় Wheat and Dal and Ghee Area অর্থাৎ রুটি দাল আর ঘিয়ের দেশ, আর বাংলা, উড়িষা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের কেরলের সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলিকে বলা যায় — Rice & Fish and Oil Area। অর্থাৎ ভাত, মাছ, তেলের দেশ। অর্থাৎ ভাত, মাছ, তেলের দেশ। এই তেল সব জায়গায় একই নয়, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যায় সরষের তেল, অন্ধ্র, কর্ণাট, তামিলনাড়ুতে তিলের তেল, কেরলে নারকলের তেল— ঘী খাইয়েরা এর একটাও পছন্দ করে না (আজকার 'ভেজিটেবল ঘী'র কল্যাণে এ বিষয়ে ভারত সমভূম হয়ে যাচ্ছে। ভারতের আহারে এর আগমনে এক ধরনের বিপ্লব এসে গিয়েছে)।

খাওয়া-দাওয়ায় পার্থক্য অল্প-বেশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থাকলেও, কতকগুলি ব্যাপারে এই খাওয়া-দাওয়াতেও একটা নিখিল ভারতীয় সাম্য দেখা যায়। ভারতীয় খাদ্যের প্রথম কথা— এতে নিরামিষের আধিপত্য। ভারতের সাধারণ খাওয়া, জাতীয় আহার হচ্ছে দাল-ভাল বা দাল-রুটি (এই রুটি কোথাও গমের আটা থেকে হয়, কোথাও বা যব থেকে, কোথাও আবার বাজরা বা মাড়ুয়া থেকে)। দালে একটু মশলা আর তেল বা ঘী থাকা চাই। ভারতের National Dish — জনপ্রিয় খাদ্য হচ্ছে ভাত আর তরকারি, তা সে নিরামিষ দাল বা সবজির ঝোল, ডালনা, শুকতোই হোক, বা মাছ মাংসের তরকারিই হোক। আন্তর্জাতিক খাদ্য-তালিকায় ভারতবর্ষ থেকে দুটি জিনিস গৃহীত হয়েছে, প্রায় সব দেশের রেস্তোঁরায় এই খাবার কখনও- না কখনও পরিবেশিত হয়ে থাকে, আর লোকে আগ্রহ করে খায়ও। সে দুটি হচ্ছে Rice and Curry অর্থাৎ মশলা-দেওয়া তরকারি (মাংস, ডিম বা মাছের) আর ভাত, আর Chutney অর্থাৎ মশলাদার টক-মিষ্টি চাটনি। এছাড়া, দক্ষিণ ভারতের ঝাল-টক দালের সুপ—যাকে 'রসম' বলে, সেটাও একটি ইংরেজ-পছন্দ খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামিলে এর নাম ''মুলগুতন্নীর'' অর্থাৎ লঙ্কার জল, Pepper water, এই নাম ইংরেজের মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে Mulliga-tawney soup।

আরও কতকগুলি খাবারের জিনিস আছে, যেগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় খাদ্য, তবে ভারতের বাইরে কারি-ভাত আর চাটনির মতো এতটা প্রসার লাভ করেনি। যেমন, খিচুড়ি — এটি সর্বত্রই প্রচলিত, কিন্তু ভারতের বাইরে দাল তেমন চলে না বলে খিচুড়ি বাইরের লোকেদের পছন্দসই হওয়া কঠিন। আর একটি ভারতীয় খাদ্য হচ্ছে পায়স বা পরমান্ন— প্রচুর খাঁটি দুধ দিয়ে তৈরি হলে এটি একটি দেবভোগ্য খাদ্য হয়, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য আর অন্তিক-প্রাচ্য দেশ ছাড়া যেমন আরব দেশ, গ্রিস — অন্যত্র এই পায়েসের তেমন রেওয়াজ নেই। ভারতের লুচি বা পুরিও তেমন বাইরে নিজের স্থান করে নিতে পারেনি।

ভারতবর্ষের পাকপদ্ধতির কৃতিত্ব বেশির ভাগ হচ্ছে নিরামিষ খাদ্য নিয়ে, আর নিরামিষের মধ্যে ভারতবর্ষ কতকগুলি ভালো মিষ্টান্নের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেগুলিও জগৎ জোড়া হতে পারেনি। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের মাছের রান্নার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর তার আছে, যেমন বাংলাদেশে। মাংস রান্নায় ভারতবর্ষ ইরানের অনুকরণই বেশি করেছে। ইরানের রান্নায় মশলার একটু আধিক্য হয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভারতের মোগলাই রান্না— রন্ধনজগতে এর একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র স্থান আছে।

ভারতবর্ষ মুখ্যত নিরামিষ-ভোজীর দেশ। মাছ মাংস যারা খায়, তাদের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় মাংস খাওয়াটা এদেশে খুবই কম। যারা খায়, তারা আবার প্রত্যেক দিন খায় না, বা পায় না। এ দেশে নিরামিষ খাদ্য-শস্য, শাক-সবজি, দাল, দুধ, এই সবেরই চল বেশি। নিরামিষ খাদ্যের সুলভতা, আর গরম দেশ বলে নিরামিষ খাদ্যের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগিতা, এই দুই কারণ ছাড়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে অহিংসার আদর্শের ব্যাপক আর গভীর প্রসার — এ দেশের নিরামিষ আহারের দিকে আকর্ষণের একটা বড়ো কারণ। আমিষ-প্রিয় বহু জাতি ভারতে এসে ক্রমে নিরামিষের ভক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের আর্যদের কথাও এই — আগে আর্যরা ছিল আমিষ প্রিয়, পরে প্রধানত নিরামিষাশী বা শাকাহারী।

প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ পশু পক্ষীর মতো খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়াত—শিকার করে মাছ ধরে বা কুড়িয়ে বাড়িয়ে বা মাটি খুঁড়ে বা খুঁটে পশু বা পক্ষীর মাংস, মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক, গুগলি কন্দ-মূল, পোকা-মাকড় যা পেত সবই খেত। পরে মানুষ পশু পালন শিখলে, যব, ধান, গম, বাজরা প্রভৃতির চাষ শিখলে, তখন গৃহপালিত পশুর দুধ আর মাংস, আর চাষের ফল শস্য, বিশেষ করে তার ভোগে এল, মানুষ খাবার সংগ্রহ করার আদিম অবস্থা থেকে খাদ্য প্রস্তুত আর সঞ্চয় করার উন্নত অবস্থায় এসে দাঁড়াল। এই সময়েই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল—পশুপালক অর্ধ-যাযাবর জাতির মানুষ যেমন আদিম আর্যরা ছিল, দুধ আর মাংসের দাস হয়ে পড়ল, আর নানা চাষি জাতির মানুষ, যেমন নিষাদ বা অস্ট্রিক প্রমুখ ভারতের অনার্য, তাদের মধ্যে চাল দাল শাক-সবজি (আর যেখানে পাওয়া যেত সেখানে মাছ, আর গৃহপালিত হাঁস মুরগি পায়রা প্রভৃতি পাখির মাংস), এই সবেরই প্রচলন বেশি হলো। গোরু ছাগল ভেড়া ঘোড়া — ভারতের অনার্যদের মধ্যে এই সকল পশুর রেওয়াজ ততটা ছিল না — চাষের কাজেও মানুষ বলদ-ঘোড়া লাঙগলের ব্যবহার তখন করত না, 'জুম' চাষ বা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে হাতের সাহায্যে চাষ, এই-ই করত। তবে এরা শূওর পুষত, শূওরের মাংস খেত।

এই রকম নানা পরিবেশের ফলে, সাধারণত আর্যেরা ভারতে আসবার আগেই ভাত, দাল, শাকসবজি, কিছুটা মাছ আর মাংস, এই ছিল প্রাগার্য জাতির মানুষের খাওয়া। আর্যেরা এল পশুপালন দুগ্ধপ্রিয় মাংসাশী জাতির মানুষরূপে। তাদের প্রিয় খাদ্য আগুনের মধ্যে দিয়ে হোম অনুষ্ঠান করে, তাদের উপাস্য দেবতাদের নিবেদন করত। এই খাদ্য ছিল, দম-বন্ধ করে অথবা অন্য নিষ্ঠুরভাবে 'আলম্ভন' করা বা হত্যা করা ছাগল, ভেড়া, গোরু, ঘোড়ার মাংস ও চর্বি, যবের রুটি 'পুরোডাশ', দুধ, ঘী, আর মাদক সোম-রস। এই সব জিনিস না হলে, আগুনে ফেলে দেবতাদের জন্য এগুলি নিবেদন না করলে, তাদের উপাসনা হতো না। অনার্যদের পূজার রীতি অন্যধরনের ছিল। আগুনের পাট এতে ছিল না। দেবতার মূর্তি বা প্রতীকের সামনে, নানা প্রকারের কাঁচা শস্য, ফলমূল, আর রান্না করা সুখাদ্য অর্পিত হতো, দেবতার প্রসাদ বলে লোকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে খেত। এই সুখাদ্যে কিছু পরিমাণ মাছ মাংস ডিমও দেওয়া হতো (ডিম এখন ভারতের হিন্দু সমাজে যেখানে আর্য বা ব্রাহ্মণ মনোভাব প্রবল সেখানে আর চলে না, কিন্তু নেপালে, ভারতের পূর্ব সীমান্তে আর ভারতের বাইরে ডিমের ব্যবহার দেখা যায়)। পশু বলি হতো, এক কোপে পশুর মাথা কেটে ফেলে, শরায় করে রক্ত নিয়ে দেবতার সামনে রাখা হতো, কোথাও বা সেই রক্ত দেবমূর্তিতে মাখিয়ে দেওয়া হতো। তবে ঠাকুরের ভোগে নিরামিষই, প্রশস্ত ছিল। হোমের অনুষ্ঠানকারী মাংসপ্রিয় আর্য জাতির মানুষ ভারতবর্ষে বসে গেল। অনার্যের প্রভাবের আওতায় এল। দুই জাতির মধ্যে রক্তে ভাষায় সংস্কৃতিতে মিশ্রণ আরম্ভ হলো, অনুলোম আর প্রতিলোম বিবাহের ফলে। মিশ্র হিন্দু জাতির সৃষ্টি হলো। তখন সামিষ আর নিরামিষ আহারের বিভিন্ন আদর্শ ও লোকের চোখের সামনে এসে পড়ল। এই দুইয়েরই সপক্ষে আর বিপক্ষে যুক্তি আর প্রচার চলল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এই সামিষ-বনাম-নিরামিষ প্রসঙ্গের অবতারণা দেখা যায়। মাংসই হচ্ছে সব চেয়ে উপাদেয়, পুষ্টিকর আর জনপ্রিয় খাদ্য, এই মত মহাভারতে স্বীকার করা হয়েছে— এটা মাংসপ্রিয় জাতির তরফের কথা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শেষ কথা হিসাবে বলা হয়েছে যে, অহিংসার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাংস বর্জন করাই সঙ্গত। অর্থাৎ নিরামিষ ভোজন যে সামিষ ভোজনের চেয়ে দার্শনিক বিচার মতে উচ্চ পর্যায়ের, এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।

ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। বৈদিক আর্যের মাংস-ভোজন এক দিকে, আর অন্য দিকে হচ্ছে পরবর্তী কালের আর্যম্মন্য হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মাংসে বিরতি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এক প্রস্থ শালি বা চাউলের ভাত, তার সিকি পরিমাণ ঘী বা তেল মশলা দিয়ে রাঁধা সূপ—সম্ভবত দাল—এই হচ্ছে 'আর্যভক্ত', অর্থাৎ আর্য বা উচ্চ শ্রেণির হিন্দুর খাওয়া। অবর বা নিম্নশ্রেণির খাদ্যে দাল আর ঘী বা তেলের অংশটা কিছু কম।

এই দাল-ভাত (কোথাও কোথাও পরবর্তীকালে দাল-রুটি) ভারতের সবচেয়ে লক্ষণীয় খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। তুর্কি মুসলমানেরা ভারত জয় করে উত্তর ভারতের রাজা হয়ে বসল খ্রিস্টীয় এগারোর শতকে। তারা রাজকার্যে সাহিত্যে ফারসি ভাষা ব্যবহার করত। তারা কি তুর্কি, কি পাঠান বা আফগান, কি ইরানি বা পারসিক—স্বদেশে খেত গমের আটার রুটি আর ভেড়ার মাংসের তরকারি— কাবাব বা শূলপক্ক মাংস, বা কোর্মা অর্থাৎ ব্যঞ্জন। এদেশে এসে তারা দেখলে, হিন্দুরা মাংস দিয়ে রুটি খায় না, তারা খায় দাল দিয়ে ভাত, শস্য দিয়ে শস্য; তাই অবাক হয়ে ফারসি ভাষায় মন্তব্য করে গেল, 'হিন্দুআন রল্লা-বা বা ঘল্লা মি-খৌর্দন্দ, ওও মি-গোয়ন্দ 'দাল-ভাত' যা 'দাল-রোতি' (— 'হিন্দুরা দানা দিয়ে দানা খায় আর বলে দাল-ভাত বা দালরোটি)। এই দাল-ভাত খাওয়ার ধারা আজ পর্যন্ত সারা ভারতব্যাপী প্রধান খাদ্য-ধারারূপে অব্যাহত আছে। জাহাঙ্গির বাদশাহের সময়ে, খ্রিস্টীয় সতেরোর শতকের প্রারম্ভে, ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক Pelsaert পেলসের্ত বলে গিয়েছেন, ভারতের লোকেদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে সিদ্ধ চাল বা ভাত, তার সঙ্গে দাল, আর তার উপর এক খামচা ঘী।

ভারতে হিন্দু আমলে যে মাংস রাঁধার পদ্ধতি ছিল, তার বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মাংসে মশলা ব্যবহারের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। 'নল-পাক' অর্থাৎ নলরাজার নামে প্রচলিত রন্ধন বিষয়ে যে সংস্কৃত বই প্রচলিত, তাতে অনেক রকমের ভাতের কথা আছে, শাক তরকারি মাংসের কথা কম। পুরাতন বাঙলা সাহিত্যের বইয়ে রন্ধনের বর্ণনা আর নানা প্রকারের ব্যঞ্জনের নাম থেকে আমরা খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে, চৈতন্যদেবের সময় থেকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বাঙালির আমিষ আর নিরামিষ খাদ্যের একটা পরিচয় পাই। তেমনি হিন্দি আর উত্তর ভারতে লেখা সংস্কৃত বই থেকে উত্তর ভারতের 'কচ্চী' অর্থাৎ কাঁচা ভোজ — দাল, ভাত, শাক, তরকারি— আর 'পক্কী' অর্থাৎ ঘৃতপক্ক উচ্চ শ্রেণির ভোজ—পুরি, কচৌরি, লাড্ডু, মিঠাই, পেঁড়া প্রভৃতির বর্ণনা পাই। খাবারের নাম থেকে তার প্রাচীনতা ধরা যায়। লাড্ডু, পেঁড়া,খাজা, পূয়া বা মালপোয়া, বুঁদিয়া এই মিষ্টান্নগুলি মুসলমান-পূর্ব যুগের। মোহনভোগ নামটা প্রাচীন—এটির কথা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া যায়, ভারতের কোথাও কোথাও এই নাম প্রচলিত আছে, কিন্তু আরবি হালুয়া এই শব্দকে অপ্রলিত করে দিয়েছে। গজা, বালুকাশাহি, জিলেবি, বরফি, কালাকন্দ—এগুলি পারস্য দেশ থেকে এসেছে। 'গজা' নামটির মূলরূপ শুনলে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু এই জনপ্রিয় মিষ্টান্নটি আর খেতে চাইবেন না।—ফারসি ''গও-জবান'' অর্থাৎ গোজিহ্বা। তা থেকে ''গও-জআঁ, গওজাঁ, গজা'' — নামের এখন এমন পরিবর্তন হয়েছে যে মূল গজার রূপ বর্ণনের জন্য আমরা এর ব্যাখ্যা করে বলি—'জিভেগজা'।

ভারতবর্ষের মিষ্টান্ন খুবই বিখ্যাত কিন্তু মিষ্টান্ন বিষয়ে মুসলমান জগৎ আর ইরানি জগৎ, আর ভারতবর্ষ, প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। আমাদের ভারতীয় মিষ্টান্ন দুই প্রকারের—এক দুধ জমিয়ে আর দুধ ফাটিয়ে, ক্ষীর আর ছানার আধারে তৈরি মিষ্টান্ন; যেমন পেঁড়া, বরফি, কালাকন্দ, গোলাপজাম, রাবড়ি;আর সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, ছানার মুড়কি, চমচম। দুধ ফুটিয়ে ছানা করে তার মিষ্টান্ন বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য—ভারতের অন্যত্র ছানার রেওয়াজ নেই। বাংলার রসগোল্লা এখন নিজগুণে 'বঙ্গাল-মিঠাই' নামে সমগ্র ভারতের এক অতি বিখ্যাত মিষ্টান্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—বহুস্থানে উচ্চাঙ্গের ভোজে রসগোল্লা থাকতেই হবে। দ্বিতীয় প্রকার মিষ্টান্ন হচ্ছে শস্য-চূর্ণের আধারে যবের ছাতু, গমের আটা, চালের গুঁড়া, দালের গুঁড়া প্রভৃতি ঘিয়ে বা তেলে ভেজে নুন বা চিনি বা চিনির রস মিশিয়ে তৈরি নোনতা বা মিষ্টি পক্কান্ন। এর উপরে আবার নারকোল কুচি বা কোরা, পেস্তা বাদাম কিশমিশ প্রভৃতি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। ইউরোপের মিষ্টান্নে Cakes and Pastry-তে ডিম থাকা চাইই — ভারতীয় মিষ্টান্নে ডিম থাকে না, ধর্মের দিক দিয়ে ডিম বারণ। হালুয়া দক্ষিণ ভারতের উপমা, লুচি, সিঙ্গাড়া (বা সম্বোসা ধোসা, নানা রকমের বড়া আর বড়ি) ভাজা আর ফুলুরি প্রভৃতি এই পর্যায়ে আসে।

খাঁটি ভারতীয় রান্নায় আবার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য আছে। উত্তর ভারতের দাল, ভাজা, শাক প্রভৃতিতে যেভাবে 'বঘার' বা ফোড়ন দেওয়া হয়, তা আমাদের দেশের ফোড়ন থেকে বা সাঁতলানো থেকে আলাদা। আবার ভাতে সিদ্ধ করে তরকারির তার বদলানো হয়। দই, তেঁতুল, আমচুর, লঙ্কা, মরিচা, গরমমশলা,

কোথাও বা ভাজা মশলা, নারকোল এসব ভারতীয় রান্নার অন্যতম প্রধান উপকরণ চীনা বা ইউরোপীয় অথবা আরব-ইরান রান্নায় এসবের পাট তেমন নেই।

ভারতের গ্রামীয় বা প্রাদেশিক রান্নার কথা নিয়ে বড়ো একখানি বই লেখা যায়। সুখের বিষয়, বাংলার নিজস্ব রান্নার সম্বন্ধে (খাঁটি বাঙালি রান্না, আর যেসব জিনিস বাঙালির হেঁসেলে স্থান পেয়েছে সেইসব বিদেশি রান্না, এই দুইয়ের সম্বন্ধে) স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখুজ্জে মহাশয়ের বিখ্যাত বই 'পাক প্রণালী' গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করবার।

মুসলমানি অর্থাৎ ইরানি-ভারতীয় (বা মোগলাই) রান্না, ভারতের রান্নারই মধ্যে পড়ে। পোর্তুগিস, ফরাসি, ডচ — এদের কাছ থেকে আর ইংরেজদের কাছ থেকেও অনেক কিছু আমরা নিয়েছি— বিশেষ মাংস-পাকে। ডচেদের Poespas হয়েছে আমাদের 'পিসপাস'— ভাতে মাংসে পাক করা—ঘৃতমিশ্র মশলা কেসর দেওয়া পোলাও নয়। ইংরিজি 'চপ কাটলেট' নামগুলি নিয়েছি, কিন্তু পদ্ধতিটা আমরা পোর্তুগিসদের কাছ থেকে শিখেছি।—ইংরিজি চপ কাটলেটে মাংসকে কিমা করে রাঁধা হয় না, হাড়শুদ্ধ পাঁজরার মাংসই এতে ব্যবহার করা হয়। ইন্দো-পোর্তুগিস যা গোয়ায় আর চাট গাঁয়ে প্রচলিত, আর অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ান রান্না, যা সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গির ইউরোপীয় হোটেল রেস্তোরাঁর বাবুর্চিখানায় প্রচলিত, এদুটিকেও ভারতীয় রান্নার মধ্যে গণ্য করতে হয়।

ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও সাত-আট শো, হয়তো হাজার দেড় হাজার বছর ধরে প্রাচীন রন্ধন পদ্ধতি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে যে ভোগ দেওয়া হয়— খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নিরামিষ রান্নার এই নিদর্শন এই কয়েক শত বৎসর ধরে অপরিবর্তিত রূপে চলে এসেছে। তেমনি দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরের ভোগের সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। এইগুলির বিশেষ আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ষের রন্ধন-শিল্পের ইতিহাসের কথা নিহিত আছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে আকবর বাদশার রন্ধনশালার ত্রিশ রকম খাদ্যের উপাদান দেওয়া আছে—দশ রকম শুদ্ধ নিরামিষ, দশ রকম মিশ্র আমিষ নিরামিষ, আর দশ রকম শুদ্ধ আমিষ। দশসের ঘি, দশসের মিসরি, দশসের সুজি, আর অন্য উপকরণ সম্ভবত এইভাবে এই ইচ্ছে বাদশাহি হালুয়ার উপাদানের প্রমাণ।

মোট কথা ভারতবর্ষের লোক যা খায়, তার একটা আলোচনা নানাদিক দিয়ে কৌতুকপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ। পার্থক্য নানা রকমের আছে। কিন্তু তবুও একটা সাধারণ ভারতীয়তা আছে। বিদেশ—লন্ডনে, প্যারিসে, নিউ-ইয়র্কে যেসব ভারতীয় ভোজনশালা আছে, সেইগুলির মাধ্যমে ভোজন বিষয়ে যে সাধারণ ভারতীয়তার বৈশিষ্ট্য ধরে দেওয়া হচ্ছে তা স্বীকার করতেই হয়। ভারতীয় ভোজনশালায় এই জিনিসগুলি থাকবেই— ভাত, দাল, নিরামিষ বা মাংস বা মাছের রকমারি তরকারি, পোলাও, হালুয়া ভাজি, পকোড়া, চাটনি, দই, 'রসগুল্লা', 'গোলাব জামুন', পাঁপড়। এই পাঁপড় একটি নিখিল ভারতীয় বস্তু। শব্দটি সংস্কৃত 'পর্পট' রূপে পাওয়া যায়—এটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে কেউ কেউ মনে করেন। 'পর্পট' থেকে 'পপ্পড-পপ্পড়', তাহাতে পাঁপড়, পপ্পড়, পাঁপর, পপডম্ ইত্যাদি আধুনিক রূপ। কিন্তু মনে হয় এই দালের পিষ্ট থেকে তৈরি এই জনপ্রিয় ভারতীয় খাদ্যবস্তু মূলে দ্রাবিড় জাতির দান তুলনীয়, তামিলে দাল অর্থে 'পপ্পু' শব্দ।

ভারতীয় আহারের অনেকখানি অংশই প্রাগার্য যুগের খাদ্যবস্তু আর রন্ধন রীতির আধারে গঠিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) : ভাষাতাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ এবং জাতীয় অধ্যাপক। জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। তিনি 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থ রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে — 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ', 'ইউরোপ ভ্রমণ', 'সাংস্কৃতিকী' প্রভৃতি। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনকথা' একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। 'পথ-চলতি' তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণের ইতিকথা।

পরশমণি

চণ্ডীদাস

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
বাঁশি কেনে ডাকে থাকি থাকি।
সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি ॥
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সেহ কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন ধনি কহি দিল তারে ॥
না দেখিয়া ছিনু ভালো দেখিয়া অকাজ হলো
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে ॥

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের নান্নুর গ্রামে। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ে চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর রচিত পদ আস্বাদনে শ্রীচৈতন্যদেব আপ্লুত হতেন। চণ্ডীদাস আজও বাংলা ও বাঙালির প্রিয়তম কবি। সহজ ভাষা ও সহজ ভাব—এই ছিল তাঁর কবিপ্রকৃতি।

'পরশমণি' শীর্ষক পদটি 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থের ৪২ সংখ্যক পদ।

সাজ ভেসে গেছে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

‘আজ্ঞে সার, নাম মইলোবাস, নিবাস সাকিন মাদারহাটি, পোস্টাআপিস গোকরোণ, থানা কান্দি, জেলা মুচ্ছিদাবাদ....’

—‘ভালো। কী চাই’

—‘আজ্ঞে, সাহায্যো!’

—‘সাহায্য? কেন? কীসের?’

— ‘আজ্ঞে সার, বেউলোর দলের।’

ব্লকের সরকারী সমাজ শিক্ষা সংগঠক ভুরু কুঁচকে তাকান।— ‘সে আবার কী?’ সঙ্গে এসেছে মতি চৌকিদার। সবিনয়ে হেসে বুঝিয়ে দেয়, ‘বেউলানখিন্দর পালা সার। পেচণ্ড বান-বন্যেয় সাজের বাকসোপেঁটরা সব ভেসে গিয়েছে। দেখুন না, দরখাস্তে অঞ্চলপ্রধান সব নিকে দিয়েছেন। মইলোবাস, দরখাস্তটা আগে দাও সারকে।’

অফিসার বাবুটি কলকাতার মানুষ। সবে চাকরি পেয়ে এই অখদ্যে জায়গায় এসেছেন। খিকখিক করে হাসেন।—‘তাই বলো। তা কী নাম বললে যেন!’

—মইলোবাস স্যাক, সার।'

অফিসার তাকান লোকটির দিকে। বছর বিয়াল্লিশের মধ্যেই বয়স সম্ভবত। বিশাল শরীর। গায়ে ময়লা হাতাগুটানো রঙিন পানজাবি, পরনে মালকোচা ধরনে ধুতি—এলাকার মাটির হলদে ছোপলাগা, পায়ে রবারের ফাটাফুটো স্যান্ডেল এবং কাঁধে তেমনি শ্রীহীন ঝোলা। লোকটার গায়ের রং তামাটে। খাড়া মস্তো নাক, বড়ো বড়ো কান, টানা চোখে হতচকিত বিহ্বলতা, কপালে তিনটে ভাঁজ। একমাথা বাবরি চুল। তিনি ফের হাসেন— 'তুমি তো শিল্পী তাহলে। আর্টিস্ট! হ্যাঁ?'

মতি হাসে। মইলোবাসও সাহস পেয়ে হাসে। মতির সলাতেই এসেছে। মতি বলে— 'হুকুম পেলে এক আসর গেয়ে দেবে, সার। কিন্তু পেচণ্ড বানে....'

মইলোবাস যুগিয়ে দেয়— 'সাজ ভেসে গিয়েছে।'

অফিসার আরামে হেলান দিয়ে বলেন— 'তো মইলোবাসটা কী, বলো তো?'

পিছনে থেকে তৃতীয় একজন, সে একেবারে তরুণ, কালো বেঁটে ও কুচ্ছিত চেহারা, পরনে ধুতি ও নীলচে হাফশার্ট, ব্যাখ্যা করে দেয়— 'নাম সার মওলা বখ্‌শ। অশিক্ষিত লোক সব। কেউ ডাকে মৌলবাস, কেউ মইলোবাস।'

— 'তুমি কে?'

— 'আমি সার বাহাসতুল্লা। দলে বৈয়ালি করি।'

— 'অ্যাঁ?'

এসব আঞ্চলিক টার্ম ভদ্রলোকের জানবার কথা নয়। মতি সব ব্যাখ্যা করে। বৈয়ালি বা বইয়ালি করা মানে প্রম্প্‌ট করা। বাহাসতুল্লা অল্পস্বল্প লেখা-পড়া জানে। সে পালার হাতেলেখা মস্তো খাতা প্রম্প্‌ট করে আসরে। তখন তাকে মাথায় হারিকেন চাপিয়ে আলো দেয় যে তার নাম নগেন বাগদি। আঙুলে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটে জ্বর হয়েছে বলে আসতে পারেনি। বানের জল নেমে গিয়ে খালে জলায় এখন বেশ মাছ হচ্ছে।

দরবার করতে আরও সব এসেছে। যে বেউলো সাজে, তার গায়ের রং কালো। হালকা গড়ন। মুখে মেয়েলি ছাঁদ। বছর পনেরো ষোলো বয়স হবে। নাম অমূল্য, জাতে বাউরী। আর লখিন্দর? সে না এসে পারে? দল-দল করেই তার বউ পালিয়েছে। তালাক দিতে হয়েছে। কারণ শ্বশুর লোকটা, ফরাজি সম্প্রদায়ের। তাদের কাছে গানবাজনা হারাম— নিষিদ্ধ। বিয়ের আগে জামাই দলের নিছক 'সাপোর্টার' ছিল। হঠাৎ আগের লখিন্দর খুনের মামলায় জেলে ঢুকল। ঢুকল তো ঢুকলই। ফিরতে বুড়ো হয়ে যাবে। তখন খোঁজো নতুন নখাইকে। লখিন্দর বা নখাই হবে সুপুরুষ — ঢলঢল রূপলাবণ্য, আসরে তাকে দেখাবে দ্বারকানদীর আদিম বিশুদ্ধ আকাশের সেই প্রকৃত চাঁদ (মাদারহাটির ধরণী তহশিলদার আজও বিশ্বাস করেন, সেই চাঁদে আমেরিকান বা রাশিয়ানদের বাবার সাধ্যি নেই পা বাড়ায় এবং সোনাই ফকির হুঁ হুঁ হেসে বলেছিল— 'এ চাঁদ কি সে চাঁদ বটে মানিকরা?') সেই চির অলৌকিক চাঁদ ঢুকবে আসরে, চাঁদসদাগরের চোখের মণি! আর চারু মাস্টারের বেহালা শুনে ছৈরদ্দির বিধবা মেয়েটা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। আসরে তখন বিপুল জ্যোৎস্নায় হাজার বছরের গ্রামীণ বিষাদ জেগে উঠবে। সে কী সহজ কথা? খোঁজো সেই আদরের নখাইকে। নখাই মিলেছিল। আকাশ আলি নাম। বাপের নাম আব্বাস হাজি। হজ করেছে—দাঁত পড়েছে। মোড়ায় বসে শণের দড়ি পাকায়। ছেলে নখাই সাজে তো কী করবে? যৈবনে মানুষ বুনো ঘোড়া। বয়স হলে তখন তৌবা করে মক্কা যাবে। ব্যাস!

আকাশ আলি হিরো। তাই তার চুলে তেল বেশি। গায়ে আদ্দির পানজাবি— কিন্তু কুঁচকে জড়োসড়ো। হাতে ঘড়িও আছে। হজে গিয়ে বাপ এনেছিল। পায়ে কাদায় ভূত কাবুলি চপ্পল।

কিন্তু সে বড়ো লাজুক। পিছনেই আছে। দরজার কাছে। আর আছে 'নারাণবাবু' তবলচি। বাবু মনে বাবুবাড়ির গাঁজাখোর উড়ুক্কু মাস্তান ছেলে। বাড়ি পাশের গাঁয়ে। ভদ্রলোকের গাঁ। বাবা ননী মুখুয্যে পোস্টমাস্টার ছিলেন। ছেলে নারাণ ক্লাস ফোরেই বেরিয়ে পড়েছে, স্বাধীনতার স্রোতে ভাসমান। মদতাড়িগাঁজাভাং জমিয়ে টেনেছে এই বয়সেই। কিন্তু সেও শিল্পী ছেলে। তবলায় ঠুংরিগাইয়ে ওস্তাদ হাবল গোঁসাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গোঁসাই বলেছিলেন— 'আয় শালা, সঙ্গ ধর।' কিন্তু সমফাঁকের মুখে গোঁসাইয়ের থাপ্পড় মারা অভ্যেস। একে তো সব সময় মাথার মধ্যে ভোঁ বাজে। অগত্যা নারাণ জুটেছে বেউলো দলে। ব্লক আপিসে দলের সঙ্গে রিপ্রেজেন্টশনে এসেছে। কারণ সঙ্গে একজন বাবুটাবু থাকা ভালোই, যদি পাত্তা দেন ওনারা।

অফিসার বলেন— 'তাহলে তুমিই চাঁদ সদাগর?'

মইলোবাস সলজ্জ মাথা নাড়ে। মতি বলে— 'শুধু তাই না সার, ও ছিল একসময় এলাকার সেরা পালোয়ান। মালামোতে ওর জুড়ি ছিল না। সাতখানা মেডেল আছে ঘরে। লতুন গামছা যে কত পেয়েছিল, হিসেব নেই। মৌরীগাঁর বাবুরা পেতলের ঘড়া দিয়েছিলেন। ওনাদের গাঁয়ে হায়ার করে এনেছিল পচ্ছিমে পালোয়ান। ভকতরাম নাম। তাকেও ধুলোপিঠ করেছিল আমাদের মইলোবাস। কিন্তু শরীলে ব্যামো ঢুকল। এখন ভেতরটা ঝাঁঝরা...'

অফিসার কেমন করে জানবেন এসব? খরার দুতিনটে মাস বৃষ্টির আশায় গাঁয়ে-গাঁয়ে মালামো হয় দিনক্ষণ দেখে। একজোড়া ঢোল বাজে। ঢোলের বোল ভারি মজার :

চোল্ টিপাকাঠি টিপ্ টিপাং
ওই শালাকে চিৎপটাং...

জড়াজড়ি দুই জোয়ান মাটিতে দাপাদাপি তুলেছে, গগন-পবন দুভাই ঢুলি তাদের ঘিরে দ্রুততালে বাজাতে থাকে... চিৎপটাং....চিৎপটাং চিৎপটাং...এবং একজন চিৎপটাং হলেই ঢোলে তেহাইয়ের শ্বাসছাড়া আওয়াজটি ওঠে—ডুড্ডুম! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে হাজার গ্রামীণ মানুষ : এই ও-ও-ও। গাঁয়ের বউঝি চমকে উঠেই হাসে। হাসিটি হাজার বছরের।

একদা মইলোবাস ছিল পালোয়ান। পালোয়ান ছাড়া চাঁদ সদাগর মানাবে কেন? সওয়া হাত বুকের ছাতি না হলে কেমন করে বেরোবে ও ভয়ঙ্কর গর্জন : 'সাবধানে চ্যাংমুড়ি কানি!'

মাথায় লাল ঝলমলে পাগড়ি, গায়ে লাল রেশমি বেনিয়ান রাংতার কাজ করা, পরনে মালকোচাকরা লাল কাপড়, আর হাতে হিন্তালের লাঠি। উঁচু হয়ে থাকা মুখ, পাকানো বিশাল গোঁপ, কপালে লাল ফোঁটা—সাজঘর থেকে হুংকার দিতে দিতে আসরে আসে— 'জয় শম্ভো! জয় শম্ভো!'

—'বলো হে চাঁদ সদাগর, একবার পার্ট বলো শুনি!'

মতি শশব্যস্তে বলে — 'নজ্জা করছে সার। সরকারি আপিস বটে কি না। আসরে হলে....'

—'উঁহু, একবার তো শুনি। নৈলে কেমন করে বুঝবো যে সত্যি আছে তোমাদের বেহুলার দল?'

সমস্যা বটে। মতি বলে— 'তিন-পুরুষের দল, সার। নিবাস আলি গোমস্তা পালাটা নেকেছিলেন আমার কত্তাবাবার আমলে। সেই খাতা এখনও আছে। তা থেকে নক্‌লে নিয়ে চলছে। বিশ্বাস না হলে এনকোয়ারি করে আসুন।'

বৈয়াল বাহাসতুল্লা বলে—'আমার দাদো এখনও বেঁচে আছে, সার। তার মুখেই শুনবেন। ছেলেবেলায় তিনি বেউলো সাজতেন! তেমন বেউলো আর হবে না সার। মৌরীতলার বাবুদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। ওনারা দুবছর আটকে রেখে রাধিকে করেছিলেন। শেষে গাঁসুদ্ধ লোক আসর থেকে তুলে নিয়ে আসে। খুব হ্যাঙ্গামা হয়েছিল সার। বাঁশির মতো গলা, আর চেহারাও সার তেমনি। এখন দেখলে মিথ্যে লাগবে।'

বিরক্ত অফিসার বলেন— 'ঠিক আছে। দেখব'খন। কিন্তু হবে কিনা বলতে পারছি না। এখন এসব ব্যাপার আপাতত বন্ধ।'

মইলোবাস অভিমানে মুখ খোলে আবার।—লক্ষ্মীনারাণপুরের মনিরুদ্দি কেষ্টযাত্রার সাজ কিনতে টাকা পেয়েছে। বাবুদের যাত্রার দল তো সব গাঁয়ে টাকা পাচ্ছে। মনিরুদ্দি আমার ভাইরাভাই সার। সে বললে তোমরাও পাবে। তাই এলাম। আসতাম না—বানে যে সাজের বাকসো ভেসে গেল। মাদারহাটিতে এক বুক পানি হয়েছিল, এনকুরি করুন। করে দেখুন!'

অফিসার তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন। তারপর একটু হেসে বলেন— 'চৌকিদার, তুমি কীসের পার্ট করো বললে না তো?'

মতি চৌকিদার—সে সরকারি লোক, পরনে রাজপোশাক, তার দাপটে মাদারহাটি থরথর করে কাঁপে। তারও কালো মুখে লজ্জার রং ঝলকে ওঠে। মাথা নীচু করে বলে— 'আমি সার সঙাল। সঙ দিই। কমিক পার্টও করি। লেজ লাগিয়ে হনুমান সাজি। চাঁদ সদাগরের লৌকো ডুবিয়ে দিই! আবার ফটিকচাঁদ কুম্ভকারও সাজি। কখনও বিবেকও হই। গান গাই।'

—'বাঃ! তাহলে তুমিই একটা গান শোনাও।'

—'আজ্ঞে?'

সকৌতুকে অফিসার বলেন— 'না শোনালে দরখাস্ত পড়ে থাকবে, চৌকিদার।'

অগত্যা একটু কেসে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে মতি সলজ্জ হেসে বলে— 'বরঞ্চ ফটিকচাঁদের গানটাই গাই, সার।'

—'বেশ, গাও।'

মতি আচমকা লাফ দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে: 'ও কে ডাকলে রে ফটিকচাঁদ পিসে/আষাঢ় মাসে চাক ঘোরে না রইয়েছি বসে/ওকে ডাকলে রে—এ-এ এ/....

আপিসসুদ্ধ তোলপাড় অমনি। এ-ঘর-ও-ঘর কেরানিবাবুরা বেরিয়ে আসেন। বিডিও সায়েব বাইরে। কৃষি অফিসার উঁকি মারেন। প্রৌঢ় হেডক্লার্ক বিরক্ত হয়ে গজগজ করেন। কিন্তু ফাইলের একঘেয়েমি হঠাৎ এক আজগুবি ঘটনার তলায় চাপা পড়ে তো মন্দ না। ভিড় জমেছে বারান্দা অব্দি। আরে বাবা, এতো শহরের কেতাদুরস্ত আপিস নয়। মাঠের মধ্যে একতালা কিছু দালান। পিছনে খাল। দিনমান চাষাভূষো লোকের আনাগোনা। আবহাওয়াটাই এ রকম। মিছিল, দাবিদাওয়া, রিলিফ, সেচ, সার, কতরকম ফরিস্তি। তার সঙ্গে কালচার। হ্যাঁ, ফোক কালচার। জাতীয় সড়কের ধারে এই বাঁজাডাঙায় এক সময় ফণিমনসা কেয়া ঝোপ আর বাজপড়া তালগাছ ছিল। সেখানে এখন এই সব বাড়ি আর ফুলবাগিচা। ইউক্যালিপ্টাসের চিরোল পাতা কাঁপে হাওয়ায়। খালের সাঁকোতে জিপের চাকা ঘটঘটাং আওয়াজ তুলে কংক্রিটে গিয়ে উধাও হয়। মাথার ওপর বিদ্যুতের তার। দূর মাঠের দিগন্তে বিশাল মঞ্চের সারি। ফলকে লেখা আছে 'এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান'। তার নীচে মড়ার মুণ্ডু আর দুটো আড়াআড়ি হাড়। তার আশেপাশে নির্ভীক চাষা লাঙল ঠেলে— উররর্‌র্‌ হট্‌ হেট্‌ হেট্‌...

ততক্ষণে চাঁদ সদাগরও তৈরি। মতির সাহসে সাহস। সামনে এক পা বাড়িয়ে দৈত্যের মতো লোকটা বিকট গর্জে বলে উঠেছে : 'খবর্দার চ্যাংমুড়ি কানি! প্রাণ যদি চলে যায়, পুবের সূর্য্যু যদি ওঠে পচ্চিমে, শিব ছাড়া ভজব না—পস্টো কথা কহে দিলাম। দূর হয়ে যাও! দূর দূর দূর...' এবং তারপর যেন পোজপশ্চার দেখিয়ে বুকের পাশে হাত চেপে চুপ করে গেছে।

হো হো করে হাসেন বাবুরা। কেউ-কেউ বলেন— বরং বেহুলার গান শোনাও হে! বেহুলা কই? আসেনি?

বাউরির ছেলে অমূল্য একটু কেসে এক কানের পেছনে হাত রেখে গেয়ে ওঠে :

একো মাসো দুয়ো রে মাসো
তিনো মাসো যায় রে সোনার কমলা॥
জলে ভেইস্যে যায় রে সোনার কমলা॥
ও কী, জলে ভেইস্যে যায় রে
সোনার কমলা॥'

সত্যি বড়ো মিঠে গলা। সুরে আদিম আবেগ আছে একটা। দুয়েকজন বাবুর ফোক সঙের বাতিক আছে। তাঁরা অভিভূত হন। একজন বলেন—'আমাগো পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাও এগুলা গাইত। আর গাজির গানও ছিল। তহন আমরা সব পোলাপান! এক্কেরে এইটুকুখানি!'

সমাজশিক্ষা সংগঠক বলেন—'রিয়েলি, আমার ধারণাও ছিল না এসব। মুসলমানেরাও বেহুলা-কেষ্টযাত্রা করে? মাই গুডনেস্! শরৎ চাটুয্যের ওই এক গহর ছিল। ভাবতুম, নিছক গুল! অথচ...ভাবা যায় না!'

মাদারহাটির বেহুলা দলটি মুখ তাকাতাকি করে। ছ'মাইল জলকাদার মাঠ ভেঙে এসেছে! সময়টা হেমন্ত। রোদ এখনও কড়া। দরদর করে ঘাম ঝরায়। সবুজ মাঠ এবার পলির রঙে হলুদ। পচা ধানপাতার কটু গন্ধ ছড়াচ্ছে। গাঁয়ে ফিরে এক দফা কটু-কাটব্য শুনতে হবে বুড়োদের। আর কিছু বলার কথা ছিল না? সাজ কেনার সাহায্য চাইতে গেলে এই দুঃসময়ে? ঘরে-ঘরে মুখ চুন, খড়িপড়া চেহারা, রিলিফের পথ চেয়ে উসখুস করছে প্রতীক্ষায়। আর এই দুঃসময়ে কিনা বেউলো দলের সাজ ভেসে গেছে, সাহায্য চাই? লক্ষ্মী-নারাণপুরের মনিরুদ্দি মাস্টার কেষ্টযাত্রার সাজ সাহায্য পেয়েছে, ভালো কথা। সেখানে তো বানবন্যা হয়নি। ডাঙা দেশ। শুখা-খরা নেই। ক্যানেলের জলে চাষ হয়। তাই বলে ডুবো দেশ মাদারহাটির তো এ সখ মানায় না—

তবে সে জন্যে এদের মুখ তাকাতাকি নয়। সার যে গহরের নাম করলেন, তাই শুনে। তার সঙ্গে চাটুয্যেও বললেন। এতেই সব প্রাঞ্জল হয়েছে। নতুন গাঁর গহর আলি পাক্কা ছড়াদার অর্থাৎ কবিয়াল। তার গুরু চাটুয্যে বটেন, তবে শরৎচন্দ্র নন—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণবাবু এখন বুড়োমানুষ। তার ওপর সেবার গাজনে নিজের বেহাইয়ের নামে (কেলেঙ্কারির) সঙের গান বেঁধে জামাই চটান এবং মেয়ের দুর্ভোগ বাধিয়ে বসেন। শেষে অব্দি মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই শেষ। ওদিকে গহরের রবরবা বেড়ে যায়। সেই গহরেরও এবার বরাত মন্দ। নতুন গাঁ ডুবেছে। গহর বুক চাপড়ে কেঁদেছে। সদ্য কিনে আনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানাও সর্বনাশা দ্বারকা ভাসিয়ে নিল! রামায়ণ-মহাভারত গেল যাক। ওস্তাদ চাটুয্যে বলেছেন—আমাদের—আমার-গুলো নিয়ে যেও। পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, প্রভাসখণ্ড চেয়ে-চিন্তে কদিনে ধারে যোগাড় করেছে রমজান দোকানির কাছে। দোকানির কারবার নুন তেলের। যৌবনে সখ ছিল ছড়াদার হবে। হতে পারেনি। কিন্তু শাস্ত্র-পুরাণতত্ত্বে মহা ধুরন্ধর সে। বড়ো বড়ো কবির আসরে প্রখ্যাত কবিয়ালদেরও আসর থেকে উঠে আচমকা

এমন প্রশ্ন করে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ে। এদিকে সন্ধ্যার নমাজের আজান শুনলে মাথায় টুপি দিয়ে মসজিদে যায়। তার তিন ছেলেও ও সব তত্ত্বে বিশারদ। বোলানের দল করেছে। তারা আসরে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চায়। পাল্টা কাবু হলে বাপের কাছে দৌড়ে আসে।.... হ্যাঁ গো, কুশঘাসের জন্ম কীসে বলে দাও তো শিগগির? রমজান হেসে বলে— বরাহ অবতারের তিন গাছা লোম তুলে রেখেছিলেন মহামুনি বাল্মীকি। তাই থেকে কুশ। তবে পাল্লাদারকে শুধোস তো বাবা, আদিতে যখন নিরাকার, তখন ভগবান ভাসলেন বটপত্রে। বটগাছ নিরাকার ব্রহ্মাণ্ডে তাহলে এল কোত্থেকে? এমনি সব পৌরাণিক রহস্যের জগতে বাস তাদের। একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বন্যায় ভেসে গেলে একটা রহস্যময় ভূভাগ হারিয়ে গেল সামনে থেকে। সবে সৃষ্টি বর্ণনাটা পড়া হয়েছিল গহরের। এই দুঃসময়ে দশটা টাকা পাবে কোথায়?

তল্লাটে একখানা আছে বটে, তার খোঁজ গহর রাখে। গুনুটির মুকুন্দ রাজবংশীর। একবার মেডেল আর কলা আসরে ঝুলিয়ে কবির লড়াই চলেছে ঈশানপুরের মেলায়। বিপক্ষ কবিয়াল প্রশ্ন করেছে, ব্রহ্মার কন্যার নাম কী? জবাব জানে না গহর। রসিক শ্রোতা মুকুন্দ আসরেই বসে ছিল। বলেছিল—নামটা আম্মো জানি। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। ঘরে শাস্তর আছে আমার। না বলতে পারলে কলা পাবে গহর। কাকুতি মিনতি করে মুকুন্দকে রাজি করাল। দুজনে চুপিচুপি শেষরাতে জলকাদা ভেঙে গুনুটি গেল। লম্ফ জ্বেলে নামটা খুঁজল। হুঁ সন্ধ্যা। দুজনে আসরে ফিরল আবার। গহর সেবার মেডেল পেয়েছিল। সেই থেকে দুজনে বড়ো ভাব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুকুন্দ প্রাণ গেলেও বই হাতছাড়া করবে না।

এসব খবর কিছু গোপন থাকে না তল্লাটে। গাইয়ে-বাজিয়েদের কাজ মানুষ নিয়ে, মানুষের সঙ্গে। আবেগবান হৃদয়। সহজেই সব গলগল করে উগলে দেয়, সমস্যা বা সুখ দুঃখ। কে না জানে সর্বনাশা বানের পর গহর হাহাকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আমার মাগ ছেলে ভেসে গেল না কেন? আমি ভাসলাম না কেন? হায় রে হায়, আমার বুকের নিধি ভেসে গেল...

তাহলে কি সরকার বাহাদুরের দয়া হয়েছে হতভাগা ছড়াদারের প্রতি? মাদারহাটির সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা মুখ তাকাতাকি করে। খুশি হয়। আশা জাগে। মতি চৌকিদার বলে— 'গহর টাকা পেল, সার?'

শুনেই অফিসার হো হো করে হাসেন। এত জোরে হাসেন! দলসুদ্ধ চোখে পলক পড়ে না। এ হাসি কীসের বোঝে না তারা। একটু পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বলেন— 'গহরকে চেনো?'

মতি বলে— 'চিনি সার। লতুন গাঁর। উঠ্‌তি কবেল। ভালো গায়।'

অতি গম্ভীর অফিসার মাথা দুলিয়ে বলেন— 'সে গহর নয়। যাক গে, শোনো! এখন তো ফ্লাড্ রিলিফের সময়। এখন কালচারাল ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেওয়া আপাতত বন্ধ। কয়েক মাস যাক। এসো। দেখব'খন।'

সকাতরে মইলোবাস বলে— 'সামনে মাসে লবান্ন হবে সার। তখন বায়না পাব। কী নিয়ে গান করব?'

—'নবান্ন?' উনি একটু হাসেন আবার। 'ধান তো পচে গেছে। নবান্ন কীসের?'

গতিক বুঝে মতি ব্যাখ্যা করে— 'ডুবো দেশে বান হয়েছে। কিন্তু ডাঙাদেশে তো ধান হয়েছে সার। সেখানে লবান্ন হবে। মাদারহাটির বেউলো না শুনে লবান্ন হবেই না। খুব নামকরা দল। অঞ্চলে পেধান...'

অফিসারটি ঘড়ি দেখে বিরক্ত হলো এবার।— 'যারা বায়না দেবে, তাদেরই বলো গে না বাবা! আপাতত কোনো উপায় নেই। আচ্ছা, তোমরা এসো। আমি বেরোব...'

সামনে অঘ্রান। এবার অঘ্রানে ডাঙাদেশে অর্থাৎ উঁচু মাটির এলাকায় শুভদিন বেছে বেছে নবান্ন উৎসব হবে গাঁয়ে-গাঁয়ে। হিন্দু-মুসলমান সবারই উৎসব। মুসলমানরা জামাই আনবে। কত খাওয়া-দাওয়া হবে। হবে না শুধু মাদারহাটি—নতুন গাঁ—ন'পাড়া— রামেশ্বরপুর এলাকার বানভাসা গাঁগুলোতে। পচা ধানের কটু গন্ধে বাতাস ভরা এখানে। বাবুরা লঙ্গরখানা খুলেছেন ইতিমধ্যে অনেক জায়গায়। টেস্ট রিলিফের কাজও চলছে অল্পস্বল্প। মাদারহাটির কাদা এখনও শুকোয়নি। ধসে যাওয়া ঘরের উঠোনে অনেক পরিবার খয়রাতি তেরপলের তলায় বাস করছে। কিছু জোতজমিওলা গেরস্থর উঁচু ভিটের বাড়ি এখনও টিকে আছে। বেউলো দলের দু-চারজনেরও দৈবাৎ টিকেছে। ঘর গেছে স্বয়ং চাঁদ সদাগরের। তার ঘরেই ছিল সাজের বাক্স। গাঁয়ের শেষে ঢালু জমিতে তার বাড়ি। নিশুতি রাতে আচমকা বিলের জল হু হু করে এসে ধাক্কা মেরেছিল। কোনোমতে বউ আর চার-পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চাকে জানে বাঁচাতে পেরেছিল। তার প্রায় সবই ভেসে গেছে। কিন্তু গতর আছে যখন, সব করে নেবে। আবার ঘর বানাতে পারবে। জমিতে চৈতালি ফলাতে পারবে। তাই সে নিয়ে ভাবনা নেই—ভাবনা সাজ ভেসে গেছে। দেড়-দুশো টাকার কমে এ বাজারে পুরো সাজ হবে না। কিছুটা চাঁদায়, কিছুটা কয়েক আসরের বায়নার টাকা জমিয়ে আগের বছর নতুন সাজ কেনা হয়েছিল। হারমোনিয়াম তবলা ঢোল কত্তালগুলো ভাগ্যিস ছিল আকাশ আলির বাড়ি। উঁচু ভিটে তাদের। সামনের খামার বা উঠোনটাও উঁচু। সেখানে বৃষ্টিহীন রাতে 'রিহাস্যাল' চলে। তাই ও বাড়ি ছিল যন্তরগুলো। যদি সাজের বাক্সটাও রাখা হতো সেখানে, এই বিপদ ঘটত না। তবে এখন আর পস্তে কী হবে?

বিনিসাজে গাইতে গেলে কেউ শুনবেই না পালা। কেন শুনবে? নগদ পাঁচ টাকা বায়না, তিন ধামা মুড়ি, আধ টিন গুড়— তার ওপর বিড়িও আছে। দুরের গাঁ হলে তো ডাল ভাতও খাওয়াতে হয়। এত সব খরচ করে লোকে সাজের ঝলমলানি দেখবে না? তা ছাড়া তলোয়ার? হায় হায়! ও দুটোও বাক্সের মধ্যে ভরা ছিল! মুকুট ছিল। ঝকমকে ত্রিশূল ছিল। বল্লম ছিল। পুঁতির মালা ছিল। হা বাবা আল্লা ভগবান! এর চেয়ে চাঁদ সদাগরকে ভাসিয়ে নিলি না ক্যানে?

মাঠের পথে দলটা গাঁয়ে ফিরে চলেছে। হতাশ, ক্লান্ত, চুপচাপ। মইলোবাস মাথাটা ঝুলিয়ে হাঁটছে সবার পিছনে। তার মনে অপরাধবোধ প্রচণ্ড। তার ঘরেই তো সাজের বাক্স ছিল। এখন ব্যর্থ দরবারের পর সেই অপরাধবোধ আরও তীব্র হচ্ছে। চাঁদ সদাগর সে। তার আত্মায় দাঁড়িয়ে আছে এক অহঙ্কারী উদ্ধত বিশাল পুরুষ—ক্রমশ দিনে দিনে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। আসরে জনমণ্ডলীর সামনে যখন সেই ভিতরের পুরুষ পা ফেলে হাঁটে—সাজঘর থেকে আসরে, তার মনে হয় কাকেও পরোয়া করার নেই। গায়ে সাজ চড়ালে দফাদার কনস্টেবল দারোগা এস-ডি-ও ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাবৎ সরকারি ব্যক্তি ও ক্ষমতাকে সে গ্রাহ্যই করবে না! আর তখন সে তো এ যুগের মানুষ নয়! তখন তার সাত ছেলে সাত সাতটা বাণিজ্যতরি নিয়ে সমুদ্দুরে চলেছে। তরি ডুবে যাওয়ার খবর দিয়েছে বিবেক। তো কীসের পরোয়া? জয় শম্ভো জয় শম্ভো! চ্যাংমুড়ি কানিকে পুজো করবে তাই বলে? হাতের হিন্তাল যষ্টি নাড়া দিয়ে গর্জন করেছে সে। তার ঠোঁটে ঘৃণা, চোখে ঘৃণা। হুঁ, এখন বাবুই হও, লাট বেলাটিই হও—তফাত যাও। চাঁদ সদাগর জানে শুধু একজনকে। তিনি শম্ভু— শিব। দেবাদিদেব মহাদেব। এই ভাই বইয়াল! আস্তে। পাট মুখস্থ আছে। গায়ে সাজ চড়ালেই সব মুখের ডগায় ভেসে আসে। সাজ চড়ালেই তাকে 'সে' এসে ভর করে—যে মাথা নোয়াতে জানে না। সাজ চড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায়

কঠিনতম লোহার বাসরঘর— দেয়াল ঘুরে হিন্তাল কাঠ কাঁধে নিয়ে পাহারা দেয়। হায়, সেই ঘরে ছিদ্র ছিল। সোনার নখাই নীলবর্ণ হলো। চাঁদ সদাগরের মাথা ঝুলে পড়ে।— 'আঃ আঃ আহা হা!'

—'কী হলো হে মইলোবাস? পাট বুলো নাকি?'

মতি চৌকিদার পিছন ঘুরে বলে। কেউ কেউ হাসে। মইলোবাস বলে, 'না।'

—'কী বুলছ মনে হলো?'

—'হুঁ, একটা কথা ভাই চৌকিদার।'

— 'বুলো।'

এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা। এ তো বাবু ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলা নয়, আপিস-কাছারিও নয়। এখন মাতৃভাষায় না বললে সুখ নেই। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মতি আবার বলে— 'বুলো হে কথাটা!'

—'যদি সাজের বাকসোটা আকাশের ঘরেই থাকত!'

মতি ভর্ৎসনা করে— 'আবার উই কথা? সেই এক কথা?'

—'ই দুঃখুটা মলেও যাবে না ভাই!'

—'আবার কিনব। ভগবান মুখ তুলে তাকাক।'

চুপ করে যায় বিশালদেহী মানুষটা। আবার ভেসে ওঠে কিছু প্রতিচ্ছবি— সামিয়ানার তলায় হ্যাসাগের শনশন শব্দ ভাসে, চারপাশে মুগ্ধ শ্রোতা, চারু মাস্টারের বেহালা বাজে করুণ সুরে। আর সাজঘর থেকে ঝলমল লাল পোশাকে হিন্তালের লাঠি নেড়ে এগিয়ে আসে চাঁদ সদাগর। কী তার রূপ! মুহূর্তে আসর চুপ। কেঁদে ওঠা বাচ্চার মুখে মায়ের থাবা পড়ে। জয় শম্ভো! জয় শম্ভো! যেন আকাশে মেঘ ডাকে।... 'সাজের বাকসোটা!'

—'আবার? তুমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, মইলোবাস। সাবোধান।'

আবার চুপ। ক্রমশ মাঠ ধাপে ধাপে নেমে গেছে নাবাল অঞ্চলের দিকে। দেখতে দেখতে সূর্যও ডুবেছে। ধূসর আলোয় দূরের গ্রাম কালো হয়ে আসছে। ধানপচার গন্ধ, পলির গন্ধ, মরা জানোয়ারের হাড়গোড়ের গন্ধ। নাক ঢেকে দলটা চুপচাপ থাকে। সবার পিছনে মইলোবাস।

এবং একটু পরেই— 'আঃ আহা হা হা!'

মতি একবার ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। কী বলবে? হাহাকার তো তার বুকেও কম জমে নেই। ডাঙাদেশে নবান্নের মরশুম এবার তাদের ফাঁকা যাবে। অন্য দল এসে গাইবে। তারা হবে শ্রোতা। গভীর ঈর্ষায় চনমন করবে। ফটিকচাঁদ কুমোর তার মতো করুক না, কে করে! তার মতো হনুমান সাজুক না, কে সাজে!

আবার পিছনে ডুকরে ওঠা চাপা আক্ষেপ—আঃ হা হা হা!

মতি চৌকিদার অফিসারকে বলছিল—এখন শরীলে ব্যামো। ভেতরটা ঝাঁঝরা। ঝাঁঝরাই বটে। সাত বছর ধরে মইলোবাস চাঁদ সদাগরের পার্ট করে আসছে। এ সাত বছর সে মালামো লড়েনি। সাত বছর আগের জ্যৈষ্ঠে তার শেষ লড়াই হয়েছে গঙ্গার পূর্বপারের প্রখ্যাত কুস্তিগির মোহিনীবাবুর সঙ্গে। কী সব মারাত্মক প্যাঁচ জানত

মোহিনীবাবু! এমনভাবে ফেলে দিল যে তারপর বাড়ি ফিরে থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠে। প্রথমটা গ্রাহ্য করেনি। পরে বুকে ব্যথা বাড়লে ডাক্তার দেখিয়েছিল। বুকের ছবি তুলতে হয়েছিল। পাঁজরের একটা কাঠি ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা পাঁজর নিয়ে সাত বছর কাটাচ্ছে। কলজেতেও একটু দাগ পড়েছে। এখনও গতর খাটতে মাঝে মাঝে টাটানি টের পায়। বোঝা তুলতে কষ্ট হয়। জোরে চেঁচাতে গিয়েও দম আটকায়।

অথচ যেদিন থেকে চাঁদ সদাগরের সাজ গায়ে চড়াল, যেন ভাঙা ঝাঁঝরা শরীলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক বিশাল শক্তিধর পুরুষ। যতক্ষণ সাজ গায়ে থাকে, ততক্ষণ সে সেই বীর্যবান দুর্ধর্ষ পুরুষ। মেঘের মতো হাঁকলেও দম আটকায় না। আসরে দেবী মনসার সামনে ভাঙা পাঁজরে হাতের থাপ্পর মেরে সগর্জনে বলে— 'সাতটা পুত্রসন্তান আমার, সাতখানি বক্খের পাঁজর। ভাঙবি তো ভাঙ রে বুড়ি চ্যাংমুড়ি, তবু কভু ভুরুক্ষেপ নাই!' সামনের মাটিতে জোরে লাথি মারে সে। টেরই পায় না কলেজটা চড়াৎ করে ওঠে কি না। কিন্তু আসরের পর দিনে মাঠের জমিতে হাল বাইবার সময় হঠাৎ খামচানি ব্যথা বুকের মধ্যিখানে—হাত চেপে সে বলদ ডাকায়—ইরর্র্র্ হেট্ হেট্

সেই ব্যথাটা এতক্ষণে অন্ধকার মাঠে জেগে উঠেছে। মইলোবাস ককিয়ে উঠছে পাঁজরে হাত চেপে— 'আঃ হা হা হা !'

মতি ভাবছে সাজের বাকসোর দুঃখে ককাচ্ছে লোকটা, বাহাসতুল্লাও তাই ভাবছে। আকাশ আলি, নারাণবাবু—আর সবাই। জলকাদায় পা ফেলার শব্দ উঠছে। চারদিকে জোনাকি উড়ছে। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। খালে এক কোমর জল। একে-একে পার হয়ে যায় সবাই। ওপারে বাঁধ। জায়গায়-জায়গায় ধসে গেছে। আর মোটে এক মাইল দূরে গাঁ। বাঁধে উঠে মতি চৌকিদার বলে— 'এসো, বিড়ি খেয়ে লিই।'

দেশলাই জ্বালে কেউ কেউ। বিড়ি ধরায়। বৈয়াল বলে— 'চাঁদ সগাদর! বিড়ি লাও হে!'

মতিও ডাকে—'কই হে নখাইয়ের বাপ! ধুঁয়োমুখ করো!'

আকাশভরা নক্ষত্রপুঞ্জ এই হেমন্তের রাতে। বাঁধের ওপর শুকনো মাটিতে বসে পড়েছে সবাই। নক্ষত্র দেখতে বিড়ি টানছে। পাশে জুতো রেখেছে। কাপড় ঊরুর ওপর গোজা—যা জলকাদা! নীচে ঘন পাটবন। বন্যায় গলা অব্দি ডুবেছিল। অন্ধকার পাটবনের ওপর জোনাকির আলো। আকাশ আলি দেখতে দেখতে ডাকে—'পিতাঠাকুর, উই দ্যাখো তুমার সাজ!' আবার মুখ তুলে আকাশ দেখে আকাশ আলি বা লখিন্দর হাসতে হাসতে ডাকে—'পিতাঠাকুর হে! পরবে নাকি উই সাজ? নকশাখানা দেখো!'

রসিক মতি রসিকতায় সাড়া দিয়ে বলে— 'তুমার পিতাঠাকুরের নাল রং পছন্দ। সেবারে খাগড়ার বাজারে সাহাবাবুর সাজের দোকানে আমার পছন্দ হলো একখানা জামা। ওইরকম কালোর ওপরে সোনালি কাজকরা। বুইলে? খাঁটি বেলবেট। আমি বুললাম—দাম? তো পঞ্চাশ টাকা। তো বুললাম, মইলোবাস, টাকা থাকলে ই সাটজাই লিতাম। তুমাকে যা মানাত! হুঁ! ঘাড় নেড়ে বুললে—আমার নাল রং পছন্দ!'

বৈয়াল বলে— 'পালোয়ান লাল রঙেরই ভক্ত!'

আকাশ ফের ডাকে—'কই বাপ পিতাঠাকুর, নখাই এত ডাকছে, কথা বুলো না ক্যানে?'

তারপর খোঁজ পড়ে যায়। সবাই ডাকাডাকি করে। দলে তো নেই, কখন পিছিয়ে পড়েছে দেখ দিকি! মতি

চেঁচিয়ে ডাকে—'মইলোবাস হে! হেই—ই—ই...'

অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জলকাদার পৃথিবীতে ডাকটা কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায়। ওই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোথায় একা থেকে গেল এক অভিমানী ক্ষুব্ধ সাজহীন বিশাল মানুষ?

ফটিক কুম্ভকার, নখাই আর বৈয়াল খালের জলে নামে। পাড়ে উঠে তিনজনে একগলায় ডাকে—'হেই-ই-ই-ই...'

আলের পথে পা বাড়াতেই ঠোক্কর খেয়ে মতি পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে— 'মইলোবাস! ও মইলোবাস! পড়ে আছ ক্যানে ভাই? কী হলো তুমার? কী হয়েছে?'

নখাই দেশলাই জ্বালে। মুখের ওপর। ঠোঁটের দুপাস রক্ত নিয়ে হাঁফাচ্ছে বিশাল সেই পুরুষ—নাকি বিশাল সেই পুরুষের খড়মাটির টাট—সাজহীন। অনেক কষ্টে বলে—'পা পিছলে পড়েছিলাম।... আমি বাঁচব না হে... বাঁচব না!'

মতি কেঁদে কেটে বলে— 'রেতের বেলা জলকাদার রাস্তায় অমন করে হাঁটে ভাই? বুয়েছি, বুয়েছি! উই কথাটাই তুমাকে খেলে হে! উই ভাবনাটাই তুমার বিনেশ কল্লে! আঃ হা হা!'

তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চলে চাঁদ সদাগরকে। পাঁজরভাঙা, কলজেয় দাগধরা শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার— 'সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা...'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) : মুরশিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬)। বহু উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লেখা কয়েকেটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', 'বিপজ্জনক', 'সোনার ঠাকুর', 'তৃণভূমি', 'অলীক মানুষ', 'নির্বাসনের দিন'। 'সাজঘর', 'চেরাপুঞ্জির পথে শীত', 'স্রোত', 'পুষ্পবনে হত্যাকান্ড', 'লড়াই', 'শূন্যের খেলা', 'বুঢ়াপীড়ের দরগতিলায়' প্রভৃতি তাঁর লেখা বিখ্যাত গল্প। 'কর্ণেল' তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোরসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় চরিত্র। সাহিত্য রচনার স্বীকৃতিতে তিনি 'ভূয়ালকা পুরস্কার', 'বঙ্কিম পুরস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার', 'নরসিংহদাস স্মৃতি পুরস্কার', 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার', 'শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার' প্রভৃতি লাভ করেন।

একাকারে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এসো, এই ঝরনার সামনে—
নতজানু হয়ে
আমাদের দুহাত-এক-করা
অঞ্জলিতে
তোমার পানি আর আমার জল
জীবনের জন্যে
একসঙ্গে একাকারে ভ'রে নিই।

দেখো, জপমালা হাতে
তোমার মা আর আমার আম্মা

জগৎজোড়া সুখ
আর দুনিয়া জুড়ে শান্তির জন্যে
একাসনে
একাকারে প্রার্থনা করছেন।

শোনো
কোরানের সুরাহ্‌র সঙ্গে
উপনিষদের মন্ত্র,
সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গে
ভোরের আজান
একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নাম। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'অগ্নিকোণ', 'চিরকুট', 'ফুল ফুটুক', 'যত দূরেই যাই', 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'জল সইতে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই', 'ধর্মের কল', 'বাঘ ডেকেছিল' প্রভৃতি। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত 'কাঁচা-পাকা', 'ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন', 'ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই', 'আমার বাংলা', 'নারদের ডায়রি', 'কমরেড কথা কও', 'ফকিরের আলখাল্লা' প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি অনুবাদ করেছেন নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদার কবিতা। বহু পুরস্কারে ভূষিত এই কবি 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি' ও 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারও পেয়েছেন।

বহুরূপী

সুবোধ ঘোষ

হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন, হরিদা, কী কাণ্ড হয়েছে?

উনানের মুখে ফুঁ দিয়ে আর অনেক ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে হরিদা এইবার আমাদের কথার জবাব দিলেন — না, কিছুই শুনিনি।

— জগদীশবাবু যে কী কাণ্ড করেছেন, শোনেননি হরিদা?

হরিদা — না রে ভাই, বড়ো মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনব? আমাকে বলবেই বা কে?
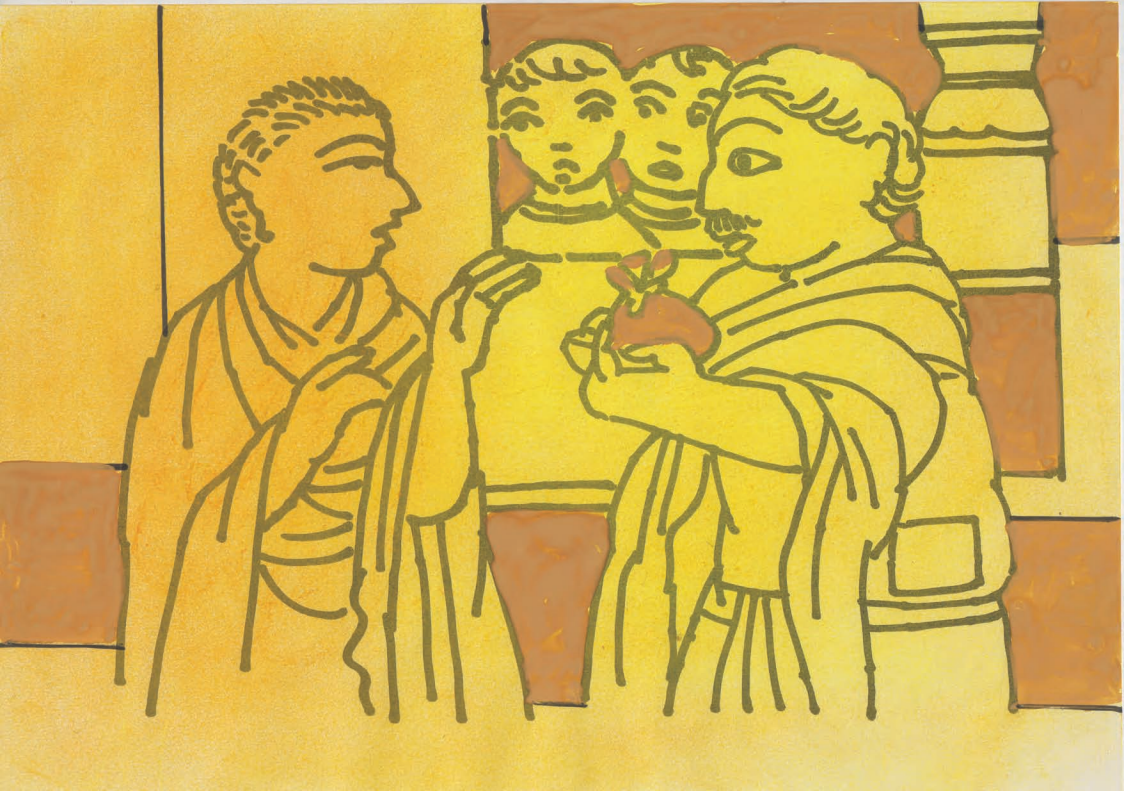
— সাতদিন হলো এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী। হিমালয়ের গুহাতে থাকেন। সারা বছরে শুধু একটি হরীতকী খান; এ ছাড়া আর কিছুই খান না। সন্ন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি বলে অনেকেই মনে করেন।

হরিদা — সন্ন্যাসী কি এখনও আছেন?

— না, চলে গিয়েছেন।

আক্ষেপ করেন হরিদা — থাকলে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম।

— তা পেতেন না হরিদা! সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস। শুধু ওই একা জগদীশবাবু ছাড়া আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী।

হরিদা — কেন?

— জগদীশবাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পা এগিয়ে দিলেন, নতুন খড়ম পরলেন আর সেই ফাঁকে জগদীশবাবু পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন।

হরিদা — বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপার!

হ্যাঁ, তা ছাড়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দেবার সময় জগদীশবাবু একশো টাকার একটা নোট জোর করে সন্ন্যাসীর ঝোলার ভেতরে ফেলে দিলেন। সন্ন্যাসী হাসলেন আর চলে গেলেন।

গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা কী বলছি বা না বলছি, সেদিকে হরিদার যেন কান নেই।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। আমাদের চায়ের জন্য এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নামিয়ে দিয়েই হরিদা তাঁর ভাতের হাঁড়িটাকে উনানে চড়ালেন।

শহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর; আর আমাদের চারজনের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা চিনি আর দুধ আমরাই নিয়ে আসি। হরিদা শুধু তাঁর উনানের আগুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।

খুবই গরিব মানুষ হরিদা। কিন্তু কাজ করতে হরিদার প্রাণের মধ্যেই যেন একটা বাধা আছে। ইচ্ছে করলে কোনো অফিসের কাজ, কিংবা কোনো দোকানের বিক্রিওয়ালার কাজ পেয়ে যেতে পারেন হরিদা; কিন্তু ওই ধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়। একেবারে ঘড়ির কাঁটার সামনে সময় বেঁধে দিয়ে আর নিয়ম করে নিয়ে রোজই একটা চাকরির কাজ করে যাওয়া হরিদার পক্ষে সম্ভব নয়। হরিদার উনানের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না। এই একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেয়ে কাজ করতে ভয়ানক আপত্তি।

হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে। আর, সেটাই যে হরিদার জীবনের পেশা। হরিদা মাঝে মাঝে বহুরূপী সেজে যেটুকু রোজগার করেন, তাতেই তাঁর ভাতের হাঁড়ির দাবি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে সত্যিই উপোস করেন হরিদা। তারপর একদিন হঠাৎ আবার এক সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে অপরূপ হয়ে পথে বের হয়ে পড়েন। কেউ চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে এক-আনা দু-আনা বকশিশ দেয়। যারা চিনতে পারে না, তারা হয় কিছুই দেয় না, কিংবা বিরক্ত হয়ে দুটো-একটা পয়সা দিয়ে দেয়।

একদিন চকের বাস স্ট্যান্ডের কাছে ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল। একটা উন্মাদ পাগল; তার মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে, চোখ দুটো কটকটে লাল। তার কোমরে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো, গলায় টিনের কৌটার একটা মালা। পাগলটা একটা থান ইট হাতে তুলে নিয়ে বাসের উপরে বসা যাত্রীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠছে যাত্রীরা, দুটো একটা পয়সা ফেলেও দিচ্ছে।

একটু পরেই বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ ধমক দেয়। — খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়ো। অন্যদিকে যাও।

অ্যাঁ? ওটা কি একটা বহুরূপী? বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয়, কেউ আবার বেশ বিস্মিত। সত্যিই, খুব চমৎকার পাগল সাজতে পেরেছে তো লোকটা।

হরিদার জীবন এইরকম বহু রূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে। এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা। সন্ধ্যার আলো সবেমাত্র জ্বলেছে, দোকানে দোকানে লোকজনের ব্যস্ততা আর মুখরতাও জমে উঠেছে। হঠাৎ পথের উপর দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দ রুমঝুম করে বেজে-বেজে চলে যেতে থাকে। এক রূপসি বাইজি প্রায় নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। শহরে যারা নতুন এসেছে, তারা দুই চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দোকানদার হেসে ফেলে — হরির কাণ্ড।

অ্যাঁ? এটা একটা বহুরূপী নাকি? কারও কারও মুগ্ধ চোখের মোহভঙ্গ হয়, আর যেন বেশ একটু হতাশস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে।

বাইজির ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি। মোট আট টাকা দশ আনা পেয়েছিলেন। আমরাও দেখেছিলাম, এক-একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই রূপসি বাইজি, মুচকি হেসে আর চোখ টিপে একটা ফুলসাজি এগিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারও হেসে ফেলে আর একটা সিকি তুলে নিয়ে বাইজির হাতের ফুলজাসির উপর ফেলে দেয়।

কোনদিন বাউল, কোনদিন কাপালিক। কখনও বোঁচকা কাঁধে বুড়ো কাবুলিওয়ালা, কখনও হ্যাট-কোট-পেন্টলুন-পরা ফিরিঙ্গি কেরামিন সাহেব। একবার পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন হরিদা; স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিলেন। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল ছেলেগুলো; আর স্কুলের মাস্টার এসে সেই নকল পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন—এবারের মতো মাপ করে দিন ওদের। কিন্তু আটআনা ঘুষ নিয়ে তারপর মাস্টারের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেই নকল-পুলিশ হরিদা।

পরদিন অবশ্য স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের জানতে বাকি থাকেনি, কাকে তিনি আটআনা ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একটুও রাগ করেননি। বরং একটু তারিফই করলেন—বা, সত্যি, খুব চমৎকার পুলিশ সেজেছিল হরি!

আজ এখন কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হরিদা এত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছেন। সন্ন্যাসীর গল্পটা শুনে কি হরিদার মাথার মধ্যে নতুন কোনো মতলব ছটফট করে উঠেছে?

ঠিকই, আমাদের সন্দেহ মিথ্যে নয়। হরিদা বললেন—আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাব।

—আমাদের দেখিয়ে আপনার লাভ কি হরিদা? আমাদের কাছ থেকে একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তো পাবেন না।

হরিদা—না, ঠিক তোমাদের দেখাব না। আমি বলছি তোমরা সেখানে থেকো। তাহলে দেখতে পাবে...।

—কোথায়?

হরিদা—আজ সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর বাড়িতে।

—হঠাৎ জগদীশবাবুর বাড়িতে খেলা দেখাবার জন্যে আপনার এত উৎসাহ জেগে উঠল কেন?

হরিদা হাসেন—মোটা মতন কিছু আদায় করে নেব। বুঝতেই তো পারছ, পুরো দিনটা রূপ ধরে ঘুরে বেড়িয়েও দু-তিন টাকার বেশি হয় না। একবার বাইজি সেজে অবিশ্যি কিছু বেশি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওতেই বা কি হবে?

ঠিকই বলেছেন হরিদা। সপ্তাহে বড়োজোর একটা দিন বহুরূপী সেজে পথে বের হন হরিদা। কিন্তু তাতে সাতদিনের পেট চলবার মতো রোজগার হয় না।

হরিদা বলেন—নাঃ, এবার আর কাঙালের মতো হাত পেতে বকশিস নেওয়া নয়। এবার মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার। একবারেই যা ঝেলে নেব তাতে আমার সারা বছর চলে যাবে।

কিন্তু সে কী করে সম্ভব? জগদীশবাবু ধনী মানুষ বটেন, কিন্তু বেশ কৃপণ মানুষ। হরিদাকে একটা যোগী সন্ন্যাসী কিংবা বৈরাগী সাজতে দেখে কত আর খুশি হবেন জগদীশবাবু? আর খুশি হলেই বা কত আনা বকশিশ দেবেন। পাঁচ আনার বেশি তো নয়।

হরিদা বলেন—তোমরা যদি দেখতে চাও, তবে আজ ঠিক সন্ধ্যাতে জগদীশবাবুর বাড়িতে থেকো।

আমরা বললাম—থাকব; আমাদের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্যে আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব!

২

বড়ো চমৎকার আজকে এই সন্ধ্যার চেহারা। আমাদের শহরের গায়ে কতদিন তো চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু কোনোদিন তো আজকের মতো এমন একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত উজ্জ্বলতা কখনও চারদিকে এমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওটেনি।

ফুরফুর করে বাতাস বইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বাগানের সব গাছের পাতাও ঝিরিঝিরি শব্দ করে কী যেন বলতে চাইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দাতে মস্ত বড়ো একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন জগদীশবাবু। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি, সৌম্য শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ জগদীশবাবু। আমরা আমাদের স্পোর্টের চাঁদার খাতাটিকে জগদীশবাবুর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

চমকে উঠলেন জগদীশবাবু। বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশবাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল।

আমরাও চমকে উঠেছি বইকি। আশ্চর্য হয়েছি, একটু ভয়ও পেয়েছি। কারণ, সত্যিই যে বিশ্বাস করতে পারছি না, সিঁড়ির কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে, সে কি সত্যিই হরিদা? ও চেহারা কি সত্যিই কোনো বহুরূপীর হতে পারে?

জটাজূটধারী কোনো সন্ন্যাসী নয়। হাতে কমণ্ডলু নেই, চিমটে নেই। মৃগচর্মের আসনও সঙ্গে নেই। গৈরিক সাজও নেই।

আদুড় গা, তার উপর একটি ধবধবে সাদা উত্তরীয়। পরনে ছোটো বহরের একটি সাদা থান।

মাথায় ফুরফুর করে উড়ছে শুকনো সাদা চুল। ধুলো মাখা পা, হাতে একটা ঝোলা, সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই, গীতা। গীতা বের করে কী-যেন দেখলেন এই আগন্তুক। তারপর নিজের মনেই হাসলেন।

আগন্তুক এই মানুষটি যেন এই জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন। শীর্ণ শরীরটাকে প্রায় অশরীরী একটা চেহারা বলে মনে হয়। কী অদ্ভুত উদাত্ত শান্ত ও উজ্জ্বল একটা দৃষ্টি এই আগন্তুকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে!

উঠে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু—আসুন।

আগন্তুক হাসেন—আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়ো?

জগদীশবাবু কিছু ভেবে বলেন—কেন? কেন আপনি একথা কেন বলছেন মহারাজ?

আমি মহারাজ নই, আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এককণা ধূলি। —কিন্তু আপনি বোধহয় এগারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড়ো বলে মনে করেন। তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, নেমে আসতে পারছেন না।

সেই মুহূর্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যান জগদীশবাবু। —আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি রাগ করবেন না।

আগন্তুক আবার হাসেন—আমি বিরাগী, রাগ নামে কোনো রিপু আমার নেই। ছিল একদিন, সেটা পূর্বজন্মের কথা।

জগদীশবাবু—বলুন, এখন আপনাকে কীভাবে সেবা করব?

বিরাগী বলেন—ঠান্ডা জল চাই, আর কিছু চাই না।

ঠান্ডা জল খেয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়েন বিরাগী। এদিকে ভবতোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে। —না না, হরিদা নয়। হতেই পারে না। অসম্ভব! হরিদার গলার স্বর এরকমেরই নয়।

বিরাগী বলেন—পরম সুখ কাকে বলে জানেন? সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া!

ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে অনাদি বলে—শুনছো তো? এসব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে?

জগদীশবাবু ততক্ষণে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছেন। বোধহয় বিরাগীর পা স্পর্শ করবার জন্যে তাঁর হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে। জগদীশবাবু বলেন—আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজি। আপনার কাছে এটা আমার প্রাণের অনুরোধ। দুই হাত জোড় করে বিরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু।

বিরাগী হাসেন—বাইরে খোলা আকাশ থাকতে আর ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকতে, আমি এক বিষয়ীর দালান বাড়ির ঘরে থাকব কেন, বলতে পারেন?

—বিরাগীজি! জগদীশবাবুর গলার স্বরের আবেদন করুণ হয়ে ছলছল করে।

বিরাগী বলেন—না, আপনার এখানে জল খেয়েছি, এই যথেষ্ট। পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করুন। কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদীশবাবু—তবে অন্তত একটু কিছু আজ্ঞা করুন, যদি আপনাকে কোনো...।

বিরাগী—না না, আমি যার কাছে পড়ে আছি, তিনি আপনার চেয়ে কিছু কম নয়। কাজেই আপনার কাছে আমার তো কিছু চাইবার দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজি, নইলে আমি শান্তি পাব না।

বিরাগী—ধন জন যৌবন কিছুই নয় জগদীশবাবু। ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা। মন-প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু সেই একজনের আপন হতে চেষ্টা করুন, যাঁকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায়। ...আচ্ছা আমি চলি।

জগদীশবাবু বলেন—আপনি একটা মিনিট থাকুন বিরাগীজি।

সিঁড়ির উপরে অচঞ্চল হয়ে একটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাগী। আজকের চাঁদের আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ হয়ে এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। ভবতোষ ফিসফিস করে—না না, ওই চোখ কি হরিদার চোখ হতে পারে? অসম্ভব!

জগদীশবাবুর হাতে একটা থলি। থলির ভিতরে নোটের তাড়া। বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করেন জগদীশবাবু—এই প্রণামী, এই সামান্য একশো এক টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিরাগীজি। আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকা আমি দিলাম।

বিরাগী হাসেন—আমার বুকের ভিতরেই যে সব তীর্থ। ভ্রমণ করে দেখবার তো কোনো দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—আমার অনুরোধ বিরাগীজি...।

বিরাগী বলেন—আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।

বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী। একশো এক টাকার থলিটা সিঁড়ির উপরেই পড়ে রইল। সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিরাগী।

৩

—কী করছেন হরিদা কী হলো? কই? আজ যে বলেছিলেন জবর খেলা দেখাবেন, সে-কথা কি ভুলেই গেলেন। আজকের সন্ধ্যাটা ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন কেন?

বলতে বলতে আমরা সবাই হরিদার ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। উনানের উপর হাঁড়িতে চাল ফুটছে। আর, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হরিদা চুপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই লজ্জিতভাবে হাসলেন।

—কী আশ্চর্য! চমকে ওঠে ভবতোষ। —হরিদা, আপনি তাহলে সত্যিই বের হয়েছিলেন! আপনিই বিরাগী?

হরিদা হাসেন—হ্যাঁ রে ভাই।

ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে রয়েছে মাদুরের উপর, আর সেই ঝোলাটা আর সেই গীতা।

অনাদি বলে—এটা কী কাণ্ড করলেন, হরিদা? জগদীশবাবু তো অত টাকা সাধলেন, অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন?

হরিদা—কী করব বল? ইচ্ছেই হলো না। শত হোক...।

ভবতোষ—কী?

হরিদা—শত হোক, একজন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে টাকা-ফাকা কী করে স্পর্শ করি বল? তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।

কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা! হরিদার একথার সঙ্গে তর্ক চলে না। আর, বুঝতে অসুবিধে নেই, হরিদার জীবনের ভাতের হাঁড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সারা হবে। অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।

অনাদি বলে—কিন্তু আপনি কি জগদীশবাবুর কাছে গিয়ে আর কখনও...।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হরিদা—যাবই তো। না গিয়ে উপায় কী? গিয়ে অন্তত বকশিশটা তো দাবি করতে হবে?

—বকশিশ? চেঁচিয়ে ওঠে ভবতোষ। সেটা তো বড়োজোর আট আনা কিংবা দশ আনা।

হরিদা বিড়ি মুখে দিয়ে লজ্জিতভাবে হাসেন—কী আর করা যাবে বল? খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরূপীর জীবন এর বেশি কী আশা করতে পারে?

সুবোধ ঘোষ (১৯১০ — ১৯৮০) : প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ বিহারের হাজারিবাগে জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার বহর গ্রামে। বিচিত্র কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো— 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'ফসিল', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', 'ভারত প্রেমকথা', 'জতুগৃহ', 'কিংবদন্তীর দেশে', 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস', 'ক্যাকটাস' ইত্যাদি। ছোটোগল্প ছাড়াও তিনি বহু উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অভিষেক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া, ধাত্রীর চরণে,
কহিলা, — "কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;— "হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা; — "হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কালসমরে, রক্ষঃ- চূড়ামণি!
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে যেমতি

হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনি; “কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?” হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, “ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।”

উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি!

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—

বাজিছে রণ-বাজনা;গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা,
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্বূরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে , চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল- ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি; — "কুম্ভকর্ণ, বলী
ভাই মম,— তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি পদে আমি বরিণু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। বাল্যবয়সেই কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় দুটি গ্রন্থ রচনা করলেও পরবর্তী পর্যায়ে কবি মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা কাব্য-কবিতার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। 'রত্নাবলী', 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক দুটি প্রহসন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। 'পদ্মাবতী' নাটকে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। 'অভিষেক' শীর্ষক কাব্যংশটি কবির 'মেঘনাদবধ কাব্য' -এর প্রথম সর্গ থেকে নেওয়া।

সিরাজদ্দৌলা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[*দরবার কক্ষ। সিরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। কর্মচারীরা যথাস্থানে উপবিষ্ট। সভাসদদের মাঝে মীরজাফর, মোহনলাল, মীরমদন, রায়দুর্লভ একদিকে—অন্যদিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, ওয়াটস্, মঁসিয়ে লা দণ্ডায়মান। গোলাম হোসেন যথারীতি নবাবের পায়ের কাছে বসিয়া আছে।*]

সিরাজ। ওয়াটস!

ওয়াটস। Your Excellency!

সিরাজ। কলকাতা জয়ে যখন আমরা যাত্রা করি, তখন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে। সুতরাং কলকাতা জয়ের ইতিহাস তুমি জান। তুমি জান যে কলকাতা জয় করে সেই নগরের নাম আমরা আলিনগর রাখি।

ওয়াটস। জানে Your Excellency!

সিরাজ। আলিনগরে তোমাদের কোম্পানির সঙ্গে যে সন্ধি হয়, তার সব সর্তও তোমাদের জানা আছে।

তোমাদের কোম্পানি সন্ধির সকল সর্ত যাতে রক্ষা করে তারই জন্যে প্রতিভূরূপে তোমাকে মুর্শিদাবাদে রাখা হয়েচে। কোম্পানি সন্ধি-সর্ত রক্ষা না করলে, যুদ্ধঘোষণার আগেই, তোমাকে আমরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারি, জান?

ওয়াটস।জানে Your Excellency!

সিরাজ। তুমি প্রস্তুত হও।

ওয়াটস। আমি জানিলাম না আমাদের অপরাধ!

সিরাজ। তোমাদের অপরাধ, সভ্যতার, শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করেচে। স্পর্দ্ধা তোমাদের আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেচে। শুধু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে এসেচি। কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা!

ওয়াটস। আপনার অভিযোগ বুঝিতে পারিলাম না!

সিরাজ। মুন্সিজি, অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের পত্র!

[*মুন্সিজি একখানি পত্র বাহির করিলেন*]

সিরাজ। এই পত্র সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

[*মুন্সি পত্র ওয়াটসকে দিলেন। ওয়াটস পড়িতে লাগিলেন*]

শেষের দিকে কী লেখা আছে?

ওয়াটস।I now acuaint you, that the remainder of the troops, which should have been here long since (and which I hear the Colonel told you he expected) will beat at Calcutta in a few days; that in a few days more I shall despatch a vessel for more ships and more troops and that I will kindle such a flame in your country as all the water in the Ganges hall not be able to extinguish.

সিরাজ। মুন্সিজি, এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন।

[*মুন্সি পত্র লইয়া বাংলা তর্জমা শুনাইলেন*]

মুন্সি। কর্নেল ক্লাইভ যে সৈন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিবে। আমি সত্বর আর একখানা জাহাজ মাদ্রাজে পাঠাইয়া সংবাদ দিব যে, আরো সৈন্য এবং আরো জাহাজ বাংলায় আবশ্যক। বাংলায় আমি এমন আগুন জ্বালাইব, যাহা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়াও নিভানো যাইবে না।

সিরাজ। ওয়াটস! এ ভীতি প্রদর্শনের অর্থ কী?

ওয়াটস। Admiral এ-কথা লিখিয়াছেন কেন, আমি বুঝি না।

সিরাজ। বুঝিয়ে আমি দিচ্ছি। মুন্সিজি, ওয়াটসের পত্র!

[*মুন্সি পত্রখানা বাহির করিলেন*]

আপনিই পড়ুন, ওর হাতে দেবেন না। আচ্ছা, ওকে একবার দেখিয়ে নিন।

[*ওয়াটস পত্র দেখিল*]

বলতে পার যে, তোমার হাতের লেখা নয়?

ওয়াটস। হাঁ, আমি লিখিয়াছে।

সিরাজ। পড়ুন মুন্সিজি!

মুন্সি। It is impossible to rely upon the Nabob and it will be wise to attack Chandernagore. নবাবের উপর নির্ভর করা অসম্ভব। চন্দননগর আক্রমণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সিরাজ। তোমাদের অভদ্রতার, ঔদ্ধত্যের আরো পরিচয় চাও? জেনে রাখো, তাও আমি দিতে পারি। আমার সভাসদরা, আমার স্বদেশীয়রা তারস্বরে ঘোষণা করে—আমি নির্বোধ,অত্যাচারী, বিলাস-সর্বস্ব; কিন্তু আমি যে সকলের শয়তানির সন্ধান রাখি, তার সামান্য পরিচয় আজ দিয়ে রাখলাম। তুমি ওয়াটস, তুমি আমারই দরবারে স্থান পেয়ে আমার সভাসদদের আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর, কলকাতায় ইংরেজদের উপদেশ দাও আমারই আদেশ লঙ্ঘন করে কাজ করতে। জান এর শাস্তি কী?

ওয়াটস। Punish me, Your Excellency, if you will. I can only say that I have done my duty.

সিরাজ। এই মুহূর্তে তুমি আমার দরবার ত্যাগ করো। ভবিষ্যতে আর কখনো এ-দরবারে তুমি স্থান পাবে না। তোমার কোম্পানি যদি সদ্ব্যবহার দিয়ে আমাকে আবার খুশি করতে পারে, তা হলো কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে কোনো সচ্চরিত্র ইংরেজকে আমি দরবারে স্থান দোব, তোমাকে নয়—আর তাও এখন নয়। যাও।

ওয়াটস। Farewell, Your Excellency!

[*নবাবকে কুর্নিশ করিয়া ওয়াটস বাহির হইয়া গেলেন*]

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। একটু অপেক্ষা করুন রাজা।—মঁসিয়ে লা!

মঁসিয়ে লা। At your command, Your Excellency.

[*সিংহাসনের সামনে গিয়া কুর্নিশ করিলেন*]

সিরাজ। তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত। তোমরা, ফরাসিরা, বহুদিন থেকেই বাংলা দেশে বাণিজ্য করচ। আমার সঙ্গে কখনো তোমরা অসদ্ব্যবহার করনি। ইংরেজদের সঙ্গে তোমাদের বিবাদ আজকাল নয়, আর এ-দেশের কোনো ব্যাপার নিয়েও নয়। সাগরের ওপারে তোমরা পরস্পর পরস্পরের টুঁটি চেপে মারলেও আমার কিছু বলবার থাকে না। আমার রাজ্যে তোমরা শান্ত হয়ে থাক, এই আমার কামনা। ইংরেজরা আমার সম্মতি না নিয়ে চন্দননগর অধিকার করেচে, সমস্ত ফরাসি বাণিজ্য কুঠি তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক এই মর্মে দাবি উপস্থিত করেচে। তোমরা প্রতিকারের আশায় আমার কাছে উপস্থিত হয়েচ।

মঁসিয়ে লা। We have always sought for your protection, Your Excellency.

সিরাজ। কলকাতা জয়ে আর পূর্ণিয়ার শওকতজঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে আমার বহু লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েচে। আমার মন্ত্রিমণ্ডলও যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। এরূপ অবস্থায়, তোমাদের প্রতি আমার অন্তরের পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, আমি তোমাদের জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে পারি না। আমার এই অক্ষমতার জন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

[সভা কিছুকাল স্তব্ধ রহিল। মঁসিয়ে-লা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে মাথা তুলিয়া নবাবের দিকে চাহিলেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন:]

মঁসিয়ে লা। Your Excellency! You refuse us your help, your protection—though with great reluctance. I appreciate your feelings. I understand the predicament you are in, I am sorry for you. And I am sorry for ourselevs. We have no other choice than to leave this land, which we have learnt to love. Allow me, Your Excellency, to warn you that you are in a great danger. On our departure from this land, the smothered flame will burst forth and will destroy you kingdom and people.

[সিরাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। মঁসিয়ে-লা'র সামনে দাঁড়াইয়া কহিলেন:]

সিরাজ। আমার বিপদ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুমি আমার প্রতি তোমার অন্তরের প্রীতিরই পরিচয় দিয়েচ। তোমার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে। প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে স্মরণ করব। তখন যেন আমাকে ভুলো না বন্ধু।

মঁসিয়ে লা। I know we shall never meet.

[দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন]

Farewell, Your Excellency!

[কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। সিরাজ তাঁহার পিছু পিছু খানিকটা অগ্রসর হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর দ্রুত ফিরিয়া রাজা রাজবল্লভের নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন]

সিরাজ। আপনি যেন কী বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, রাজা?

রাজবল্লভ। এখন সে কথা নিরর্থক।

[সিরাজ হাসিয়া বলিলেন]

সিরাজ। জানেন ত! আমাকে কোনো কথা বলেই লাভ নেই—সর্ব-চিকিৎসার বাইরে আমি!

[সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন]

রাজবল্লভ। ওয়াটস সাহেবকে ওরকম করে বিদায় না দিলেও চলত।

[সিরাজ ফিরিয়া আসিলেন]

সিরাজ। ওয়াটস-ক্লাইভ-ওয়াটসন কোম্পানির কথা থাক, ইংরেজ-ফরাসি- পোর্তুগীজ প্রসঙ্গ পরিহার করুন। নিজেদের কথা বলুন রাজা, নিজেদের কথা ভাবুন।

জগৎশেঠ। ভাবা যখন উচিত ছিল, তখন যে কিছুই ভাবেননি জাঁহাপনা!

[সিরাজ দ্রুত তাহার দিকে ফিরিলেন]

সিরাজ। সে অপরাধ কি বার বার আমি স্বীকার করিনি! আপনাদের সকল অভিযোগ অবনত মস্তকে আমি গ্রহণ করিচি। কখনো কোনো কটূক্তির প্রতিবাদ করিনি। আপনাদের স্পর্দ্ধা নিয়ে কখনও প্রশ্নও তুলিনি। আপনারা সারা দেশে আমার দুর্নাম রটিয়েচেন, কর্মচারীদের মনে অশ্রদ্ধা এনে দিয়েচেন, আত্মীয়-স্বজনের মন দিয়েচেন বিষিয়ে। আর কত হেয় আমাকে করতে চান আপনারা?

জগৎশেঠ। আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করে আমাদের লাভ?

সিরাজ। স্বার্থসিদ্ধি।

জগৎশেঠ। স্বার্থের সন্ধানে আমরা যদি নিযুক্ত থাকতাম—

সিরাজ। বলুন, তা হলে?

জগৎশেঠ। তা হলে বাংলার সিংহাসনে এতদিনে অন্য নবাব বসতেন।

সিরাজ। এত বড়ো কথা আমার মুখের ওপর বলতে আপনার সাহস হয়।

জগৎশেঠ। আপনার উপদ্রবই আমাদের মনে এই সাহস এনে দিয়েচে।

সিরাজ। আমার উপদ্রব নয় শেঠজি, আমার সহিষ্ণুতাই আপনাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে!

মীরজাফর। জাঁহাপনা মানী-লোকের মানহানি করে আপনি আমাদের সকলেরই অপমান করেচেন।

সিরাজ। সকলে মিলে আপনারাই কি আমার কম অপমান করেচেন!

রাজবল্লভ। আমরা কেউ মিথ্যা কলঙ্ক রটাইনি।

সিরাজ। সত্যাশ্রয়ী রাজা! বলুন, সিংহাসনে আরোহণ করবার পরে, এই এক বছরের মধ্যে, কী অনাচার আমি করিচি? বলুন কটা রাত আমি নিশ্চিন্তে কাটিয়েচি, কটা দিন আপনারা আমাকে বিশ্রামের অবসর দিয়েচেন? বলুন!

রাজবল্লভ। আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালী আমাদের কণ্ঠস্থ থাকবার কথা নয়।

সিরাজ। অথচ কবে, কোথায়, কখন, কোন অনাচার আমি করিচি, তা আপনারা নির্ভুল বলে দিতে পারেন!

রাজবল্লভ। পারি এই জন্যই যে পাপ কখনও চাপা থাকে না!

সিরাজ। পাপ যে চাপা থাকে না, হোসেনকুলী প্রাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

[*রাজবল্লভের সম্মুখে গিয়া*]

নিজের জীবন দিয়ে কি আবার তা বুঝতে চান?

[*রাজবল্লভ মাথা নীচু করিলেন*]

শেঠজি, জাফর আলি খাঁ, আপনাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন!

মীরজাফর। এই তরবারি স্পর্শ করে আমি শপথ করচি জাঁহাপনা, আপনি যদি মানী-লোকের এইরূপ অপমান করেন, তা হলে আপনার স্বপক্ষে কখনো অস্ত্র ধারণ করব না।

মোহনলাল। আজ পর্যন্ত কদিন তা ধারণ করেচেন, সিপাহসালার?

মীরজাফর। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে অপদার্থ শওকতকে হত্যা করে বুঝি এই স্পর্দ্ধা তোমার হয়েচে মোহনলাল?

মীরমদন। কোনো যুদ্ধে কৃতিত্ব না দেখিয়েও আমি জিজ্ঞাসা করচি, কলকাতা জয় থেকে শুরু করে পূর্ণিয়া বিজয় পর্যন্ত কবে সিপাহসালার নবাবকে সাহায্য করেচেন?

মীরজাফর। জাঁহাপনা! নীচের এই স্পর্দ্ধা!

মোহনলাল। নীচপদস্থ কর্মচারীদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়, এ-কথা যেমন আপনাদের সব সময়েই মনে থাকে, তেমন এ-কথাও মনে রাখা কি উচিত নয় যে, নবাবের কাজের সমালোচনাও সব সময়ে শোভন নয়?

মীরমদন। এ রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান সেনাপতি, আমির ওমরাহ, রইস রাজা, মনে করেচেন, নবাব একেবারে অসহায়; সিংহাসন রক্ষা ত নয়ই—আত্মরক্ষার শক্তিও তাঁর নেই। আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না, এ কথা তাঁদের মনে রাখা উচিত।

মীরজাফর। এই সব অর্বচীনকে দিয়েই যখন নবাবের কাজ চলবে, তখন চলুন রাজা রাজবল্লভ, চলুন শেঠজি, চলুন দুলর্ভরায়, এই দরবার আমরা ত্যাগ করি। নবাব থাকুন তাঁর কর্মক্ষম, শক্তিমান, পরম বিচক্ষণ মন্ত্রী আর সেনাপতিদের নিয়ে। গোলামহোসেন, মোহনলাল আর মীরমদন যখন রয়েচে, তখন আর ভাবনা কী? চলুন!

[*রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, দুর্ল্লভরায় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন*]

সিরাজ। দাঁড়ান!

[*সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন*]

দরবার ত্যাগ করতে হলে নবাবের অনুমতি নিতে হয়, এ কথাও আপনাদের মনে করিয়ে দিতে হবে?

মীরজাফর। দরবার ত্যাগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি জাঁহাপনা।

সিরাজ। বাধ্য হয়ে দরবার ত্যাগ করতে হবে আপনাদের তখন, যখন আপনাদের বন্দি করা হবে। মুন্সিজি, সিপাহসালারের কাছে ওয়াটস যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্র।

[*মুন্সিজি পত্র বাছিতে লাগিলেন*]

মীরজাফর। আমার কাছে ওয়াটস পত্র লিখেছিলেন!

সিরাজ। হাঁ, নবাবের সিপাহসালার! খোজা পিদ্রুর মারফৎ ওয়াটস এই পত্রখানি আপনারই উদ্দেশে পাঠিয়েছিল; কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হস্তগত হয়েচে। দেখতে চান?

মীরজাফর। নবাবের অনুগ্রহ।

সিরাজ। সভাসদদের শুনিয়ে দোব?

মীরজাফর। পত্রের বিষয় ত আমি অবগত নই জাঁহাপনা।

সিরাজ। সবাইকে শুনিয়ে আপনাকে লজ্জা দেবো না। কেন না আপনি আমার সিপাহসালার। পত্রখানা আপনাকে দেখতেও দোব না, কেন না তা হলে যে উদ্দেশ্যে এই পত্র প্রেরিত হয়েছিল, তাই সিদ্ধ হবে।

মীরজাফর। জাঁহাপনা তা হলে কী করবেন স্থির করেচেন?

সিরাজ। রাজদ্রোহে লিপ্ত প্রজা সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা উচিত বিবেচনা করেন?

[*মীরজাফর কোন কথা কহিলেন না*]

রাজা রাজবল্লভ কী বলেন?

রাজবল্লভ। আমারও কোনো গোপন-লিপি কি জাঁহাপনা আবিষ্কার করেচেন?

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভকে আমরা চিনি। তিনি কাঁচা কাজ করেন না। জাফর আলি খাঁ!

মীরজাফর। নবাব কি প্রকাশ্য দরবারেই আমার বিচার করতে চান?

[*নবাব তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন*]

সিরাজ। জাফর আলি খাঁ! আজ বিচারের দিন নয়, সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন! অন্যায় আমিও করেছি, আপনারাও করেচেন। খোদাতালার কাছে কে বেশি অপরাধী তা তিনিই বিচার করবেন। আজ আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন যে, বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।

রাজবল্লভ। এই দুর্দিনের জন্য কে দায়ী জনাব?

সিরাজ। আবারও বিচার রাজা!

রাজবল্লভ। বিচার নয় জাঁহাপনা। আমি বলতে চাই যে, এখনও সময় আছে। এখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আপোষে নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

সিরাজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আপোষ! রাজা, ওয়াটসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও কি আপনারা তাদের মনোভাব বুঝতে পারেননি? কলকাতায় সৈন্যসমাবেশ, চন্দননগর আক্রমণ, কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান, সবই কি শান্তি স্থাপনের প্রয়াস?

জগৎশেঠ। নবাব যদি কলকাতা আক্রমণ না করতেন, তা হলে এসব কিছুই আজ হতো না।

সিরাজ। কলকাতার দুর্গকে তারা যদি দুর্ভেদ্য করে তুলতে না চাইত, তা হলে আমাকেও কলকাতা আক্রমণ করতে হতো না! বাংলাদেশ অরাজক ছিল না। কোম্পানির দুর্গ প্রতিষ্ঠার কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারেন?

মীরজাফর। আপনি আমাদের কী করতে বলেন জাঁহাপনা!

সিরাজ। সবার আগে বলি—বাংলার মান, বাংলার মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সর্বরকমে আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাই, তা হলে একদিন আপনারা আমার বিচারে বসবেন। সেদিন যে দণ্ড আপনারা দেবেন, আমি মাথা পেতে নোব। আমাকে অযোগ্য মনে করে আর কাউকে যদি এই সিংহাসনে বসাতে চান, আমি হৃষ্টমনে সিংহাসনে ছেড়ে দোব।

[*সকলে নীরব রহিলেন*]

জাফর আলি খাঁ, আপনি শুধু সিপাহসালার নন, আপনি আমার পরম আত্মীয়। বিপদে আপন-জন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে যার কাছে দাঁড়ানো যায় সেই না আত্মীয়। লোভে পড়ে, অথবা মোহের বশে, মানুষ অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে লোভ মোহ জয় করে যে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পাবে, সেই ত পুরুষ। সে পৌরুষ আপনার আছে, আমি জানি।

[*একটু চুপ করিয়া সকলের মুখভাব লক্ষ করিয়া দেখিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন*]

রাজা রাজবল্লভ, ভাগ্যবান জগৎশেঠ, শক্তিমান রায়দুর্লভ, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়---মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। অপরাধ আমি যা করিচি, তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করিচি—আঘাত যা পেয়েচি তাও মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেই পেয়েচি। পক্ষপাতিত্বের অপরাধে কেউ আমরা অপরাধী নই। সুতরাং আমি মুসলমান বলে আমার প্রতি আপনারা বিরূপ হবেন না।

[*আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। আবার বলিলেন:*]

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য

আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?

মীরজাফর। জাঁহাপনা, জনাব!

সিরাজ। আপনি! হাঁ আপনি সিপাহসালার, আপনিই তা পারেন।

মীরজাফর। আমি শপথ করচি জাঁহাপনা, আজ থেকে সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে, আপনার সহায়তা করব।

মোহনলাল। আমিও শপথ করচি সিপাহসালারের সকল নির্দেশ মাথা পেতে নোব।

মীরমদন। তাঁর আদেশে হাসিমুখেই মৃত্যুকে বরণ করব।

সিরাজ। আমি আজ ধন্য! আমি ধন্য!

গোলামহোসেন। জনাব, পলাশির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন।

সিরাজ। হাঁ, পলাশি! সিপাহসালার, পলাশি-প্রান্তরে আমাদের সৈন্য সমাবেশ করতে হবে। ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির ফৌজ সেই পথেই এগিয়ে আসছে। আপনার আদেশ পালন করবার জন্য রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, মোহনলাল, মীরমদন, সিনফ্রে, সবাই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমিও আপনার আদেশবহ হয়ে থাকব। আপনাদের আর আমি দরবারে আবন্ধ রাখব না। আপনারা পলাশি যাত্রার আয়োজন করুন!

[*প্রথমে সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং পরে সভাসদগণ দরবার ত্যাগ করিলেন। রহিলেন শুধু সিরাজ আর গোলামহোসেন। সিরাজ চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন, সামনে নুইয়া পড়িয়া সিংহাসনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘাড় ঘুরাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিলেন*]

সিরাজ। গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা!

সিরাজ। সিংহাসন কি টলছে?

গোলামহোসেন। না, জাঁহাপনা।

সিরাজ। ভালো করে দ্যাখ ত।

[*দুইজনেই সিংহাসন দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ঘসেটিবেগম প্রবেশ করিলেন, দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তারপর কহিলেন:*]

ঘসেটি। ওখানে কী দেখচ মূর্খ, বিবেকের দিকে চেয়ে দ্যাখো!

সিরাজ। কে!

[*দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঘসেটিকে দেখিলেন। হাসিয়া কহিলেন*]

ও আপনি!

[*কাছে অগ্রসর হইলেন*]

কাজ আছে? তা স্মরণ করলেই ত দেখা করতাম।

ঘসেটি। নবাবের অবসরের বড়োই অভাব, না?

সিরাজ। বিপদ এমনি ঘনিয়ে আসচে যে, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়িচি।

ঘসেটি। এখনও বিপদ? ঘসেটি বেগম তোমার বন্দি, শওকতজঙ্গ রণক্ষেত্রে নিহত, প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোথাও নেই, এখনও বিপদের ভয়!

সিরাজ। কোম্পানির ফৌজ কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান করেচে।

ঘসেটি। করেচে!

সিরাজ। সেই সংবাদই পেয়েচি!

ঘসেটি। তা হলে মুর্শিদাবাদেও তারা আসবে?

সিরাজ। তেমনি দুর্দিন কে কামনা করে মা!

ঘসেটি। দুর্দিন না সুদিন?

সিরাজ। সুদিন!

ঘসেটি। সুদিন নয়? ঘসেটির বন্ধন মোচন হবে, সিরাজের পতন হবে, সুদিন নয়?

সিরাজ। আপনি বুঝতে পারচেন না, আপনি কী বলচেন!

ঘসেটি। বেশ বুঝতে পারচি। অন্তরে যে কথা দিন-রাত গুমরে গুমরে মরচে, তাই আজ ভাষায় প্রকাশ করচি। মাসিকে তুমি গৃহ-হারা করেচ, মাসির সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েচ, মাসিকে দাসী করে রেখেচ। মাসি তা ভুলবে?

সিরাজ। অকারণে অভাগাকে আর তিরস্কার করবেন না।

ঘসেটি। অকারণে!

সিরাজ। নয় কি?

ঘসেটি। মতিঝিল কে অধিকার করেচে? আমার সঞ্চিত সম্পদ কে হস্তগত করেচে? কে আমার পালিত পুত্রকে সিংহাসন থেকে দূরে রেখেচ? তুমি নও, দস্যু?

সিরাজ। মতিঝিল আপনারই রয়েচে মা।

ঘসেটি। তা হলে সেখানে যাবার অধিকার কেন আমার নেই?

সিরাজ। রাজনীতির কারণে।

ঘসেটি। তোমার রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ? আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই—আছে শুধু প্রতিহিংসা। এই প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ হবে সেইদিন—যেদিন তোমার এই প্রাসাদ অপরে অধিকার করবে, তোমাকে ঐ সিংহাসন থেকে ঠেলে ফেলে শওকতজঙ্গের মতো কেউ যেদিন তোমাকে...

[লুৎফা ছুটিয়া আসিল]

লুৎফা। মা, মা, তোমার মুখের ও-কথা শেষ কোরো না মা।

ঘসেটি। নবাব-মহিষী!

লুৎফা। নবাব-মহিষী নই মা, তোমার কন্যা।

ঘসেটি। নবাব-মহিষী নও? আজ ভাবচ খুবই বিনয় করলে, কিন্তু দুদিন বাদে ওই কথাই সত্য হবে। এই আমার মতো জীবন যাপন করতে হবে!

লুৎফা। নবাব!

ঘসেটি। নবাব-মহিষী এই বাঁদির বিরুদ্ধে অভিযোগ করচেন নবাব। বাঁদিকে দণ্ড দিয়ে মহিষীকে খুশি করুন!

লুৎফা। জাঁহাপনা, ওকে ওঁর প্রাসাদে ফিরে যেতে দিন।

সিরাজ। দোব লুৎফা—সময় এলেই পাঠিয়ে দোব।

ঘসেটি। এখনো আশা—সময় আসবে?

লুৎফা। অমন করে ওকথা বলো না মা। বুক আমার কেঁপে ওঠে।

ঘসেটি। তোমার বুক কেঁপে ওঠে। আর আমার বুক যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তা কি তোমরা বুঝেচ, না কখনো বুঝতে চেয়েচ? অনাথা বিধবা আমি, নিজের গৃহে দুঃখকে সাথি করে পড়েছিলাম, অত্যাচারের প্রতিকারে অক্ষম হয়ে ডুকরে কেঁদে সান্ত্বনা পেতাম। তোমরা তাতেও বাদ সাধলে, ছল করে ধরে এনে পাপ-পুরীতে বন্দিনী করে রাখলে। তোমাদের আমি ক্ষমা করব!

সিরাজ। আর আমরাই বুঝি ক্ষমা করব বিদ্রোহিনীকে। মায়ের মতো সম্মান দিয়ে মায়ের বোনকে মায়ের পাশেই বসিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। তোমার তা ভালো লাগচে না! আজ ভয় হচ্ছে শেষটায় না বাধ্য হয়ে তোমাকে বন্দিনীর মতোই কারাগারে স্থান দিতে হয়।

লুৎফা। নবাব! জাঁহাপনা।

সিরাজ। ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত এই বাক্যজ্বালা আমি আর সইতে পারি না লুৎফা! এমন কোনো অপরাধ আমি করিনি, যার জন্যে সকলের কাছে সব সময়ে অপরাধীর মতো আমাকে করজোড়ে থাকতে হবে।

[*দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেন*]

ঘসেটি। অপরকে বঞ্চিত করে যে সিংহাসন পেয়েচ, সে সিংহাসন তোমাকে শান্তি দেবে ভেবেচ?

সিরাজ। আমি জানি কেমন করে ওদের কণ্ঠ রোধ করা যায়, কেমন করে স্পর্দ্ধায় উন্নত ওদের শির আমার পায়ের তলায় নুইয়ে দেওয়া যায়। শুধু আমার মুখের একটি কথা, চোখের একটি ইঙ্গিত সাপেক্ষ। আমি তাও পারি না। পারি না শুধু আমি কঠোর নই বলে, পারি না শুধু পরের ব্যথায় আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে।

[*ক্ষোভে দুঃখে সিরাজ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লুৎফা তাঁহার কাছে গিয়া কহিলেন*]

লুৎফা। নবাব, জাঁহাপনা, আপনার চোখে জল? আমি যে সইতে পারি না।

ঘসেটি। আজকার এ কান্না শুধুই বিলাস; কিন্তু এ কান্নায় বিরাম নেই। চোখের জলে নবাব পথ দেখতে পাবেন না। বেগমকে আজীবন আমারই মতো কেঁদে কাটাতে হবে। আমিনা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে! পলাশি-প্রান্তরে কোলাহল ছাপিয়ে উঠবে ক্রন্দন-রোল! সিরাজের নবাবির এই পরিণাম!

[*ঘসেটি চলিয়া গেলেন। নবাব তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, লুৎফা তাঁহাকে ধরিলেন*]

সিরাজ। বলতে পার লুৎফা, বলতে পার, ওই ঘসেটি বেগম মানবী না দানবী?

লুৎফা। ওকে ওর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন জাঁহাপনা। ওর সঙ্গে থাকতে আমার ভয় হয়। মনে হয়, ওর নিশ্বাসে বিষ, ওর দৃষ্টিতে আগুন, ওর অঙ্গ-সঞ্চালনে ভূমিকম্প!

সিরাজ। মাত্র পনেরোটি মাস আমি রাজত্ব করচি, লুৎফা! এই পনেরো মাসে আমার এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছে, মানুষেরা এমনি নির্মমতার পরিচয় আমি পেয়েচি যে, কোনো মানুষকে শ্রদ্ধাও করতে পারি না, ভালোও বাসতে পারি না।

লুৎফা। চলুন জাঁহাপনা, একটু বিশ্রাম করবেন।

সিরাজ। বিশ্রাম! বিশ্রামের অবসর হবে পলাশির পর।

লুৎফা। পলাশি! সে কি জাঁহাপনা?

সিরাজ। তুমি এখনও শোনোনি? পলাশির মাঠে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা।

লুৎফা। আবার যুদ্ধ! জাঁহাপনা?

সিরাজ। পনেরো মাসের নবাবি লুৎফা, তার মাঝে পুরো একটি বছর যুদ্ধে, ষড়যন্ত্রভেদে, গুপ্তচর পরিচালনায় অতিবাহিত হয়েচে। এইবার হয় ত শেষ যুদ্ধ!

লুৎফা। শেষ যুদ্ধ!

সিরাজ। যদি জয়ী হই, তা হলে হয়তো আর যুদ্ধ হবে না—আর যদি পরাজিত হই, তা হলে তো নয়ই!

লুৎফা । পলাশি!

সিরাজ। পলাশি! লাখে লাখে পলাশ-ফুলের অগ্নি-বরণে কোনোদিন হয়তো পলাশির প্রান্তর রাঙা হয়ে থাকত, তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা। জানি না, আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশি, রাক্ষসী পলাশি!

[*নবাব বাহির হইয়া গেলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। করুণ সুরে বাদ্য বাজিল। যবনিকা পড়িল*]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২—১৯৬১) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনায়। বিখ্যাত নাট্যকার। ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। শিক্ষক সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে সাংবাদিকতার পাঠ নেন। তিনি 'হিতবাদী' পত্রিকায় সখারামের সহযোগী ছিলেন। পরে 'বৈকালী', 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সহ-সম্পাদক হিসেবে 'দৈনিক কৃষক' ও 'ভারত' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁর কালজয়ী নাটকগুলি লিখেছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে— 'সিরাজদ্দৌলা', 'গৈরিক পতাকা', 'রক্তকমল', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'ধাত্রী পান্না', 'এই স্বাধীনতা', 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রভৃতি। তাঁর নাটকের প্রধান গুণ স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবোধ। তিনি শুধু নাটক রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, নাট্যমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

প্রলয়োল্লাস

কাজী নজরুল ইসলাম

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে —
ধূম্র-ধূপে
বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!

ওরে ওই　　হাসছে ভয়ংকর!
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর —

ওরে ওই　　স্তব্ধ চরাচর!
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর!!

দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা ভয়াল তাহার নয়নকটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়নজলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোলতলে !
বিশ্বমায়ের আসন তারই বিপুল বাহুর পর —

হাঁকে ওই　　'জয় প্রলয়ঙ্কর !'
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ওই বিনাশে !
এবার মহানিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর —

আলো তার　　ভরবে এবার ঘর !
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব　　জয়ধ্বনি কর !!

ওই সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্রগানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগনতলের নীল খিলানে !
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে !
এই তো রে তার আসার সময় ওই রথঘর্ঘর —
শোনা যায় ওই রথঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন — জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে —
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ওই ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।
কাল-ভয়ংকরের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর ! —
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ‘বিজলী’ পত্রিকায় ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশিত হলে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ‘বিদ্রোহী’ কবি নজরুলের প্রতিবাদের হাতিয়ার ছিল তাঁর গান ও কবিতা। কবি তাঁর লেখায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। নজরুলের কবিতা ও গান চিরকাল বাঙালিকে উদ্দীপিত করে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘অগ্নিবীণা’, ‘বিষের বাঁশি’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘ফণীমনসা’, ‘প্রলয়শিখা’, ‘ছায়ানট’, ‘চক্রবাক’ প্রভৃতি।

পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হলঘরে জন-ছয়েক বাঙালি মোট-ঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোটো-বড়ো পুঁটলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশি দিন নাই; ভিতরের কী একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোটো কি বড়ো, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ-সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কী যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। —কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলোআনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কী বল অপূর্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড়ো বড়ো চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোটো করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি, —অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুগ্ন, কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুক-পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোনো বালাই নাই। পরনে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা— হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি, —কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে, —ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কালচরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কী হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স বিছানা তো খানাতল্লাশি হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কী আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেচি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখো জগদীশ, কীরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কল্‌কেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, গাঁজা খাবার সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে, খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে, —এই তো তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই, —এই মাত্র! নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে। মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কী বল জগদীশ, পারে তো? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়োবাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাঁহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বান্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থরপদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

আশ্চর্য এই যে, এত বড়ো সব্যসাচী ধরা পড়িল না, কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্যকেও অপূর্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় ফিরিয়া দাড়ি-গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোশাক-পরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলায় বাধা পাইল না সত্য, কিন্তু ঠিক কী যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই, অথচ চোখ-কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতেই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলওয়ারকর লক্ষ করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি?

কৈ না।

বাড়ির খবর সব ভালো তো?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিল, যতদূর জানি সবাই ভালোই তো আছেন।

রামদাস আর কোনো প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্র বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার মা কিংবা বাটীর আর কোনো আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন ততদিন এই ছোটো বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব রাজি হইয়াছিল। আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই-সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্তই যাইতে পারিত, কেবল উপরের সেই ক্রিশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকাকড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহূত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত ফর্দ করিয়া কী আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মত পাশ-করা অ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষেও বিস্ময়কর। বাস্তবিক, এমন তৎপর, এতবড়ো কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ারকর ! তা ছাড়া এত বড়ো বন্ধু !

রামদাস কহিল, তার পর?

অপূর্ব বলিল, তেওয়ারি ঘরে ছিল না, বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল, ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অনুমান কতকটা তাই। চুরি না করুক, সাহায্য করেচে।

তার পর?

তারপর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাশা দেখালে যে ও-কথা আর মনেই হলো না। এখন ভাবচি, যা গেছে তা যাক, তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও রুচি, তাহার বল-বীর্য, তাহার রামধনু রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নালঠোকা পাম্প শু, তাহার নেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনোমতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুঁশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মতো নির্বোধ আহম্মক হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ; আপনার চোর ধরে দেবার জন্যে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাংলা দেশের পুলিশ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। তা ছাড়া আমার বড়ো লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু। বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়তো আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে-ই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল,—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়তো শোভন হয় নাই। অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সতেজে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে তো তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, যাঁকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছেন তিনি ঢের বেশি আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজি, এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।

অপূর্ব কহিল, থাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,—শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে-কোনো দেশে, যে-কোনো যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল; মনে মনে বুঝিল কী কথায় কী কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, বলিল, তোমার মতো সাহস আমার নেই, আমি ভীরু, কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস। বিনা দোষে ফিরিঙ্গি ছোঁড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশনমাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশি লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মতো দুর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ারকর! এমন তো নিত্য-নিয়তই ঘটচে,—আমার মা, আমার ভাই-বোনকে যারা এই-সব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।

রামদাসের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কৈ এ ঘটনা তো আমাকে বলেন নি?

অপূর্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না, কিন্তু, আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়-পাঁজরা ভেঙে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশি হয়ে গেল। তোমাকে জানাব কি—মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সুমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় কী একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্বর ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সেই দিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্বে বড়োসাহেব একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্বর ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের ভামোর আফিসে কোনো শৃঙ্খলাই হচ্চে না। ম্যান্ডালে, শোএবো, মিক্‌থিলা এবং এদিকে প্রোম সব-কটা আফিসেই গোলযোগ ঘটচে। আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে আস। আমার অবর্তমানে সমস্ত ভারই তো তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—সুতরাং বেশি দেরি না করে কাল-পরশু যদি একবার—

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে পারি। বস্তুত, নানা কারণে রেঙ্গুনে তাহার আর একমুহূর্ত মন টিকিতে ছিল না। উপরন্তু, এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে। অতএব যাওয়াই স্থির হইল, এবং পরদিনই অপরাহ্ণবেলায় সুদূর ভামো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল আরদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারি খবরদারির জন্য বাসাতেই রহিল। পা-ভাঙা সাহেব হাসপাতালে পড়িয়া, সুতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষত, এই রেঙ্গুন শহরটা বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারির পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোনো কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

গাড়ি ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট-পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে।

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল মোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এই দিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, চিনতে পারি বৈ কি বাবুমশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্যে কহিল, আপাতত ভামো যাচ্চি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঞ্জাং থেকে দুজন বন্ধু নোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রান করা। হাঁ, আনে বটে কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি নুকিয়ে, কিন্তু, আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চুরিতে—কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াবয়। লল্লাটের লেখা তো খণ্ডাবে না।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আমারও তো তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েছে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোনো ধার ধারিনে,—সেদিন কেবল তামাশা দেখতেই গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজি, ম্যয় নে আপকো তো জরুর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবু সাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা যায়গায় তো ঘুমতা হ্যায়,—

অপূর্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যে সন্দেহ রাখবেন না বাবুমশায়, আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না। বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে—বাবুমশায় আপনারা—

অপূর্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে, তা হলে নমস্কার। এখন তবে আসি,—বাবুসাহেব, রাম রাম—বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদগত কাশির বেগ সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, এই সব্যসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু সদলবলে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন তলওয়ারকর। বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু এই হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না। পরক্ষণে বাঁশি বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল, কিন্তু তখনও মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব লক্ষ করিল না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত এই মুহূর্তকালের মধ্যে রামদাসের প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটের উপরে যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সুদূর দুর্নিরীক্ষ্য লোকেই তাহার সমস্ত মনশ্চক্ষু একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব প্রথম শ্রেণির যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরানের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া বিনা জলেই সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিল, এবং যে-সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্রমতে স্পর্শদুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল, পিতলের পাত্র হইতে বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালি পূর্বাহ্ণেই রাখিয়া গিয়াছিল, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল, অতএব রাত্রির মতো অপূর্ব ভোজনাদি শেষ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পরিতৃপ্ত সুস্থচিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড়ো ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার-তিনেক তাহার ঘুম ভাঙাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম ও ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বর্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি তো ইউরোপিয়ান নও।

অপূর্ব কহে, না। কিন্তু আমি তো ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রে তো আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করিতে পারো না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য,—আমি পুলিশ; ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

(সম্পাদিত)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) : জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে। রবীন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ণময় জীবনের অধিকারী শরৎচন্দ্রের লেখায় তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। বাংলার গ্রাম-জীবন এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা তাঁর গল্প উপন্যাসে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে— 'বড়দিদি', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি',' চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে 'লালু', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি পাঠক মহলে আজও সমাদৃত। পাঠ্য রচনাটি তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগে এই উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

প্রভাবতী সম্ভাষণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, এ জন্মের মতো, সহসা সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। প্রতিক্ষণেই, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে — যেন, তুমি বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 'নীনা' বলিয়া, করপ্রসারণপূর্বক, কোলে লইয়া বলিতেছ। যেন, তুমি উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, 'আয় না' বলিয়া, সলীল করসঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ। যেন, আমি আহার করিতে গিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহদেবীকে, প্রভাবতী কোথায়, এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি শ্রবণমাত্র, সত্বর পদসঞ্চারে আসিয়া, 'এই আমি এসেছি' বলিয়া, প্রফুল্লবদনে, আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছ। যেন তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'শোলো' বলিয়া, আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিতেছ। যেন, আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ; আর সকলে, সাতিশয় আহ্লাদিত মনে, সহাস্যবদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন। যেন, আমি বিকালে বাড়ির ভিতরে জল খাইতেছি; তুমি ক্রোড়ে

বসিয়া, আমার সঙ্গে জল খাইতেছ ; এবং জল খাওয়ার পর, আমি মুখে সুপারি দিবামাত্র, তুমি 'দুখুনি দে' বলিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা, আমার মুখ হইতে সুপারি বহিষ্কৃত করিয়া লইতেছ। যেন, তুমি বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্বক, আকুল চিত্তে বলিতেছ, 'নাফাস্‌নি, পড়ে যাব'। আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না আমি লাফাব। তুমি অমনি, ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, 'দেখ্ দিখি মা, আমার কথা শোনে না'। যেন, তোমার দাদারা, উনি আর তোমায় ভালো বাসিবেন না, এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছে। তুমি তাহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি আর না ভালোবাসি, এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া, 'ভালো বস্‌বি, ভালো বস্‌বি' এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালন সহকারে বারংবার বলিতেছ। যেন, আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছি। তুমি, 'এই খা' বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। তুমি, 'তবে এই খা' বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে, তুমি, আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।

এইরূপে, আমি সর্বক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও নিরতিশয়প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি ;কেবল তোমার কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। দৈবযোগে এক দিন, দিবাভাগে, আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণকালের জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অভূতপূর্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এই আকস্মিক মর্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সেদিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল। তুমি স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

বৎসে! কিছুদিন হইল আমি নানা কারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থার অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোনও অংশে, কিঞ্চিমাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সব শরীর তৎক্ষণাৎ যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রায় একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে ; কিন্তু কোনও পরিবারেই , তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সব-সাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তুমি যে স্বল্পকাল সংসারে ছিলে, তাহা আদরে আদরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, অস্নেহ বা অনাদর কাহারে বলে এক মুহূর্তের নিমিত্ত, তোমায় তাহার অনুমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই।

কিন্তু এই নৃশংস সংসারে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিলে, উত্তরকালে তোমার ভাগ্যে কী ঘটত তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হয়ত, ভাগ্যগুণে সৎপাত্রে প্রতিপাদিত্য ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠাতা, হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে ; নয়ত ভাগ্যদোষে, অসৎ পাত্রের হস্তগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে হইত। যদি, পরমযত্নে ও পরম আদরে পরিবর্ধিত করিয়া, পরিশেষে, তুমি অবস্থার বৈগুণ্যনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিতেছ, ইহা দেখিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বোধ হয়, তোমার অতর্কিত অন্তর্ধাননিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা, সে যাতনা বহু সহস্র গুণে গরীয়সী হইত। তুমি, স্বল্পকালে সংসারব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, আমাদের সেই সম্ভাবিত অতি বিষম আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ। তোমায় যে, ক্ষণকালের জন্য, কাহারও নিকট কোনও অংশে, অনুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না, আদরে আদরে নরলীলা সম্পন্ন করিয়া গেলে, ইহা ভাবিয়া, আমি আমার অবোধ মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিব।

বিশেষত দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বন্ধ হইয়া, প্রৌঢ় অবস্থায়, তোমার যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত, নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই, তুমি তৎসমুদয় সম্যক সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রভাববলে, তুমি শ্বশুরালয় প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলে। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শনপূর্বক, ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে। কখনও কখনও , 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে। কখনও কখনও, 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া সঙ্কুচিত ভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে ; এবং, সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত', এই বলিয়া, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতা প্রদর্শন করিতে। কখনও কখনও, 'শ্বাশুড়ির পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে।

এইরূপে, তুমি সংসারযাত্রা সংক্রান্ত সকল লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তরকালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই, ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কাজ করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে ; হয়ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশত, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি দীর্ঘজীবনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিত না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়া ছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধ সেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু আমি, ইচ্ছানুরুপ, জলপ্রদানের পরিবর্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই, তোমার পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না ; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া নিঃসন্দেহে, তোমার উৎকট পিপাসা নিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে। তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া , জলপ্রার্থনাকালে আমার দিকে, বারংবার যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চিরদিনের নিমিত্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমার মতো পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিকভাবে ভালো বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর তুমি যে আমায় আন্তরিকভাবে ভালোবাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ এই অনুসন্ধান করতে। এক্ষণে, এত দিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া আমি অতি বিষম অসুখে কালযাপন করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কীভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে ! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্মম হইয়া, এ জন্মের মতো, অন্তর্হিত হইয়া, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কিনা, জানতে পারিতেছি না; আর হয়ত, এতদিনে আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ ; কিন্তু, আমি তোমার, কস্মিন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্রপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরুক রাখিব, তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই — যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মতো, অবিরত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।

(সম্পাদিত)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) : জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ছাড়াও বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ-রোধ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বোধোদয়', 'ঋজুপাঠ', 'কথামালা', 'বর্ণ পরিচয়', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব', 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রতিবাদ, অন্যদিকে মানবিকতার উজ্জ্বল প্রভায় ভাস্বর।

সিন্ধুতীরে

সৈয়দ আলাওল

কন্যারে ফেলিল যথা জলের মাঝারে তথা
দিব্য পুরী সমুদ্র মাঝার।
অতি মনোহর দেশ নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ
সত্য ধর্ম সদা সদাচার॥
সমুদ্রনৃপতি সুতা পদ্মা নামে গুণযুতা
সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান।
উপরে পর্বত এক ফল ফুলে অতিরেক
তার পাশে রচিল উদ্যান॥
নানা পুষ্প মনোহর সুগন্ধি সৌরভতর
নানা ফল বৃক্ষ সুলক্ষণ।
তাহাতে বিচিত্র টঙ্গি হেমরত্নে নানা রঙ্গি
তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ॥

পিতৃপুরে ছিল নিশি   নানাসুখে খেলি হাসি
যদি হৈল সময় প্রত্যুষ।
সখীগণ করি সঙ্গে   আসিতে উদ্যানে রঙ্গে
সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস॥
মনেতে কৌতুক বাসি   তুরিত গমনে আসি
দেখে চারি সখী চারিভিত।
মধ্যেতে যে কন্যাখানি   রূপে অতি রম্ভা জিনি
নিপতিতা চেতন রহিত॥
দেখিয়া রূপের কলা   বিস্মিত হইল বালা
অনুমান করে নিজ চিতে।
ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধরি   কিবা স্বর্গভ্রষ্ট করি
অচৈতন্য পড়িছে ভূমিতে॥
বেকত দেখিয়ে আঁখি   তেন স-বসন সাক্ষী
বেথানিত হৈছে কেশ বেশ।
বুঝি সমুদ্রের নাও   ভাঙ্গিল প্রবল বাও
মোহিত পাইয়া সিন্ধু-ক্লেশ॥
চিত্রের পোতলি সমা   নিপতিত মনোরমা
কিঞ্চিৎ আছয় মাত্র শ্বাস।
অতি স্নেহ ভাবি মনে   বলে পদ্মা ততক্ষণে
বিধি মোরে না কর নৈরাশ॥
পিতার পুণ্যের ফলে   মোহর ভাগ্যের বলে
বাহুরক কন্যার জীবন।
চিকিৎসিমু প্রাণপণ   কৃপা কর নিরঞ্জন
দুখিনীরে করিয়া স্মরণ॥
সখী সবে আজ্ঞা দিল   উদ্যানের মাঝে নিল
পঞ্চজনে বসনে ঢাকিয়া।
অগ্নি জ্বালি ছেকে গাও   কেহ শিরে কেহ পাও
তন্ত্রে মন্ত্রে মহৌষধি দিয়া॥
দণ্ড চারি এই মতে   বহু যত্নে চিকিৎসিতে
পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।
শ্রীযুত মাগন গুণী   মোহন্ত আরতি শুনি
হীন আলাওল সুরচন॥

সৈয়দ আলাওল : সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান কবি সৈয়দ আলাওল ঘটনাচক্রে আরাকানরাজের অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত হন। তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। 'সয়ফুলমুলুক বাদিওজ্জমাল' প্রধানমন্ত্রী-মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি রচনা করেন। এছাড়াও তিনি 'সপ্তপয়কর', 'তোহফা', 'দারাসেকেন্দরনামা', 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

অদল বদল

পান্নালাল প্যাটেল

হোলির দিনের পড়ন্ত বিকেল। নিম গাছের নীচে গাঁয়ের একদল ছেলে জড়ো হয়ে ধুলো ছোড়াছুড়ি করে খেলছিল।

হাত ধরাধরি করে অমৃত ও ইসাব ওদের কাছে এল। দুজনের গায়েই সেদিনকার তৈরি নতুন জামা। রং, মাপ, কাপড় — সব দিক থেকেই একরকম। এরা দুজনে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। রাস্তার মোড়ে এদের বাড়ি দুটোও মুখোমুখি। দুজনের বাবাই পেশায় চাষি, জমিও প্রায় সমান সমান। দুজনকেই সাময়িক বিপদ আপদে সুদে ধার নিতে হয়। বলতে গেলে ছেলেদুটোর সবই একরকম, তফাত শুধু এই যে, অমৃতের বাবা-মা আর তিন ভাই রয়েছে, ইসাবের আছে শুধু তার বাবা।

দুই বন্ধুতে মিলে শান-বাঁধানো ফুটপাথে এসে বসতে, ওদের একরকম পোশাক দেখে দলের একটি

ছেলে বলল, ‘ঠিক, তোরা দুজনে কুস্তি কর তো, দেখি তোরা শক্তিতেও সমান-সমান, না একজন বড়ো পালোয়ান।’

আরেকটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, ‘লড়ে যা তোরা, বেশ মজা হবে।’

ইসাব অমৃতের দিকে তাকাল। অমৃত দৃঢ়স্বরে বলল, ‘না, তাহলে মা আমাকে ঠ্যাঙাবে।’

অমৃতের অত জোর দিয়ে বলার কারণ ছিল। বাড়ি থেকে বেরাবার সময় ওর মা সাবধান করে দিয়েছিলেন, ‘নতুন জামা পাবার জন্য তুমি কী কাণ্ডটাই না করেছিলে; এখন যদি তুমি জামা ময়লা করে বা ছিঁড়ে আসো, তাহলে তোমার কপালে কী আছে মনে রেখো।’

অমৃত সত্যি তার বাবা-মাকে খুব জ্বালিয়েছিল। শোনা মাত্র অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল, ঠিক ইসাবের মতো জামাটি না পেলে ও স্কুলে যাবে না।

মা ওকে অনেক বুঝিয়েছিল, ‘ইসাবকে ক্ষেতে কাজ করতে হয় বলে ওর জামা ছিঁড়ে গেছে, আর তোরটা তো প্রায় নতুনই রয়েছে।’

‘মোটেই না,’ বলে কাঁদতে কাঁদতে অমৃত ওর জামার একটা ছেঁড়া জায়গায় আঙুল ঢুকিয়ে আরো ছিঁড়ে দেয়।

মা তখন ওকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বললেন, ‘নতুন জামা দেবার আগে ইসাবের বাবা ওকে খুব মেরেছিলেন, তুইও সেরকম মার খেতে রাজি আছিস?’

অমৃত এতেও পিছপা হতে রাজি নয়। ও মরিয়া হয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, আমাকে বেঁধে রাখো! মারো! কিন্তু তোমাকে ইসাবের মতো একটা জামা আমার জন্য জোগাড় করতেই হবে।’

ইসাবের মা এসব ঝামেলা থেকে বাঁচবার জন্য বললেন, ‘ঠিক আছে, তোর বাবাকে গিয়ে বলগে।’

অমৃত জানত মা ‘না’ বললে ওর বাবার রাজি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্রও সে নয়। ও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল, খাওয়া ছেড়ে দিল এবং রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে রাজি হলো না। শেষমেশ ওর মা হাল ছেড়ে দিয়ে অমৃতের বাবাকে ওর জন্য নতুন জামা কিনে দিতে রাজি করালেন। এর পর উনি গিয়ে ইসাবের বাবার গোয়ালঘর থেকে লুকিয়ে থাকা অমৃতকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

সুন্দর সাজগোজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমৃতের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না জামাকাপড় নোংরা হয় এমন কিছু করতে। বিশেষ করে ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়তে তো একেবারেই গররাজি।

এমন সময় ছেলেছোকরার দঙ্গল থেকে একজন এসে হাত দিয়ে অমৃতের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘এসো, আমরা কুস্তি লড়ি।’

এই বলে সে অমৃতকে খোলা মাঠে নিয়ে এল। অমৃত ওর বাঁধন কেটে বেরুবার চেষ্টা করতে করতে বলল, ‘দেখ্ কালিয়া, আমি কুস্তি লড়তে চাই না, আমাকে ছেড়ে দে।’ কালিয়া তো ওকে ছাড়লই না, বরং ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল। ছেলের দল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ‘কালিয়া জিতেছে, অমৃত হেরে গেছে, কী মজা, কী মজা।’

ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল। ও কালিয়ার হাত ধরে বলল, ‘আয়, আমি তোর সঙ্গে লড়ব।’ কালিয়া ইতস্তত করছিল, কুস্তি শুরু হয়ে গেল। ইসাব ল্যাং মারতে কালিয়া ব্যাঙের মতো হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে চ্যাচাতে লাগল।

তামাশা করে হলেও এখন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়েছে এবং কালিয়ার বাবা-মা এসে ওদের পিটুতে পারে বুঝতে পেরে সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল।

অমৃত আর ইসাবও রণভূমি ত্যাগ করল। কিছুটা যেতেই অমৃতের নজরে এল যে ইসাবের জামার পকেট ও ছ'ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় ছিঁড়ে গেছে। ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওরা জামা কতটা ছিঁড়েছে পরীক্ষা করছে, এমন সময় শুনতে পেল ইসাবের বাবা ইসাবকে ডাকছেন।

ওদের তখন বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হবার জোগাড়, ওরা জানে ইসাবের বাবা ছেঁড়া শার্ট দেখা মাত্র ওর চামড়া তুলে নেবে। উনি সুদখোরের কাছ থেকে টাকা ধার করে অনেক বাছাবাছি করে কাপড় কিনে জামা সেলাই করিয়েছিলেন।

ইসাবের বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে কাঁদছে, ইসাব কোথায়?'

হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ও ইসাবকে টানতে টানতে বলল, 'আমার সঙ্গে আয়।' ওদের দুই বাড়ির মাঝখানে ঢুকে অমৃত জামার বোতাম খুলতে লাগল। ও হুকুম দিল, 'তোর জামা খুলে আমারটা পর।'

ইসাব বলল, 'তোর কী হবে, তুই কী পরবি?'

অমৃত বলল, 'শিগগির কর, নয়তো কেউ দেখে ফেলবে। আমি তোরটা পরব।'

'ইসাব জামা খুলতে লাগল, যদিও অমৃত কী করতে চাইছে বুঝতে পারছিল না, বলল, ''জামা অদল-বদল? কিন্তু তাতে সুবিধাটা কী হবে, তোকে তো তোর বাবা পিটোবে।'

অমৃত বলল, 'নিশ্চয় ঠ্যাঙ্গাবে, কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে।'

ইসাবের মনে পড়ল, ও দেখেছে যে, অমৃতের বাবা যখনই মারতে গেছেন, অমৃত ওর মায়ের পেছনে লুকিয়েছে। মার হাতে অবশ্য ওকে দু'চার থাপ্পড় খেতে হয়েছে, কিন্তু বাবার ভারী হাতের মারের কাছে ও কিছুই নয়।

ইসাব তবু ইতস্তত করছে, এমন সময় সে খুব কাছে কাউকে কাশতে শুনল, তক্ষুণি ওরা ঝটপট জামা অদল-বদল করে, গলি থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে নিঃশব্দে যে যার বাড়ির দিকে চলল।

ভয়ে অমৃতের বুক ঢিপঢিপ করছিল। কিন্তু ওর কপাল ভালো দিনটা ছিল হোলির, সে সময় সবাই জানে কিছুটা ধস্তাধস্তি টানা হ্যাঁচড়া চলে। মা যখন দেখলেন জামাটা ছিঁড়েছে, উনি ভুরু কুঁচকোলেন কিন্তু মাফ করে দিলেন। একটা সুঁচসুতো নিয়ে ছেঁড়া জামাটা রিফু করে দিলেন।

এতে দুজনেরই ভয় কেটে গেল, ওরা আবার হাত ধরাধরি করে গ্রামের ধারে হোলির সময়কার বাজি আর বুড়ির বাড়ি পোড়ানো দেখতে গেল।

একটা ছেলে ওদের জামা বদলানো দেখেছিল, সে ওদের আনন্দ মাটি করার জন্য বলল, 'তোরা অদল-বদল করেছিস, হুম্।'

সে তাদের জামা অদল-বদল করা দেখে ফেলেছে এই আশঙ্কা করে তারা চলে যেতে চাইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য ছেলেরাও কি ঘটেছে জেনে চ্যাঁচাতে লাগল, 'অদল-বদল, অদল-বদল!' অমৃত আর ইসাব সরে পড়তে চাইল, কিন্তু ছেলের দল তাদের পেছনে পেছনে 'অদল-বদল, অদল-বদল!' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। বাবারা তাদের ব্যাপারটা জেনে ফেলবে মনে করে তারা ভয়ে বাড়ির দিকে ছুটে পালাতে লাগল।

ইসাবের বাবা বাড়ির সামনের দাওয়ায় খাটিয়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন, তিনি ওদের ডাকলেন, 'তোমরা বন্ধুদের কাছ থেকে পালিয়ে আসছ কেন? আমার কাছে এসে বসো।'

ওঁর শান্ত গলা শুনে ওদের চিন্তা হলো, ভাবল, 'যা ভেবেছিলাম তাই হলো, উনি আসল ঘটনাটা জানেন, শুধু ভালোবাসার ভান করছেন।'

ইসবের বাবা পাঠান, উনি দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'বাহালি বৌদি, আজ থেকে আপনার ছেলে আমার।' বাহালি বৌদি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'হাসান ভাই, আপনি এক ছেলেকেই দেখে উঠতে পারেন না, তা দুজনকে কী করে সামলাবেন?'

আবেগ ভরা গলায় হাসান বললেন, 'বাহালি বৌদি, অমৃতের মতো ছেলে পেলে আমি একুশজনকেও পালন করতে রাজি আছি।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে পাঠান বাহালি বৌদিকে বললেন, 'ছেলে দুটোকে গলিতে ঢুকতে দেখেই ভেবে নিলাম, দেখতে হবে ওরা কী করে।' পাড়া-পড়শি মায়ের দল পাঠানের গল্প শোনার জন্য ঘিরে দাঁড়াল।

উনি অল্প কথায় ছেলেদের জামা বদলের গল্পটা বললেন, আরো বললেন, 'ইসাব অমৃতকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর বাবা যদি তোকে মারে কী হবে? অমৃত কী জবাব দিয়েছিল জানেন? বলেছিল কিন্তু আমার তো মা রয়েছে।'

সজল চোখে পাঠান বললেন, 'কী খাঁটি কথা! অমৃতের জবাব আমাকে বদলে দিয়েছে। ও আমাকে শিখিয়েছে, খাঁটি জিনিস কাকে বলে।'

অমৃত ও ইসাবের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার গল্প শুনে তাঁদেরও বুক ভরে গেল।

ইতিমধ্যে ছেলের দল বাজি আর বুড়ির বাড়ি পোড়ানো দেখে ফিরছিল। তারা ইসাব অমৃতকে ঘিরে বলতে লাগল, 'অমৃত-ইসাব- অদল-বদল, ভাই অদল-বদল।'

এবার অবশ্য ইসাব ও অমৃত অপ্রস্তুত বোধ করল না, বরঞ্চ অদল-বদল বলাতে তাদের ভালোই লাগল।

অদল-বদলের গল্প গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্রাম-প্রধানের কানে গেল। উনি ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে আমরা অমৃতকে অদল আর ইসাবকে বদল বলে ডাকব।'

ছেলেরা খুব খুশি হলো, ক্রমশ গ্রাম পেরিয়ে আকাশ বাতাসও 'অমৃত-ইসাব অদল-বদল, অদল-বদল' এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল।

তরজমা : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত

পান্নালাল প্যাটেল (১৯১২-১৯৮৯) : গুজরাতি ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক পান্নালাল প্যাটেল রাজস্থানের দুঙ্গারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ আর গ্রামজীবন তাঁর রচনায় প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়েও তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংগ্রহ 'সাচা সম্মান', 'জিন্দেগি কা খেল', 'লাখ চোরাসি', 'সুখ দুখনান সাথী', 'কোই দেশি কোই পরদেশি', 'আসমানি নজর' প্রভৃতি। সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে রঞ্জিত রাম সুবর্ণচন্দ্রক এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

ঘাস

জীবনানন্দ দাশ

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস — তেমনি সুঘ্রাণ —
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি — চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। পড়াশুনো প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন একাধিক কলেজে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ প্রভৃতি। তাঁর রচিত আখ্যানের মধ্যে রয়েছে — ‘কারুবাসনা’, ‘বাসমতীর উপাখ্যান’, ‘মাল্যবান’, ‘সুতীর্থ’, ‘জলপাইহাটি’ প্রভৃতি। ‘কবিতার কথা’ তাঁর লেখা একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ।

মানুষের ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোশ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোশগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর -একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোশের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বব্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।

শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোশগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায় ; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোশগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে একদিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হতো না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাছাড়া সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোশের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানি ও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্ত ঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ ; কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়, আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সংকেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবনযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ওইটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ওই প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজারলক্ষ প্রাণীর। কিন্তু, মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে

তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই ; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কথা বলা চলে না যে, দাঁড়াবে না তো কী। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু, মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ওই দুই পায়ের উপরেই । সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষবয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয়, সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায়, চারপেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না — এইজন্যেই অন্যের পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েছে বলেই যত পেরেছে ভার সৃষ্টি করেছে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্ততভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়াল।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে প্রায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের । উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত-অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয় সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত।

...মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে Whole-time কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায় — অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'এ-সব কেন।' একমাত্র তার উত্তর, 'আমার খুশি।' তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্প-কলায় এই এক উত্তর, 'আমার খুশি'। মাথাতোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুরছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভান। কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার

আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই-সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের ক্ষেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলাভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি, হাল-লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তাছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে ; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের ক্ষেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর-তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব, স্বাধীন দায়িত্ব, তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হলো। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

(সম্পাদিত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী ও বালক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings' এর জন্য। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য'। 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। সাহিত্য সমালোচনা ছাড়া ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি 'শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ', 'বাংলাভাষা পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থে কবির ধর্মজিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হলো 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'শিক্ষা', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ অজস্র স্মৃতিকথা, চিঠি, দিনলিপি লেখেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', 'জীবনস্মৃতি', 'জাপানযাত্রী', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথের সঞ্চয়', 'ছেলেবেলা', 'আত্মপরিচয়', 'ছিন্নপত্র' এবং বহুখণ্ডে সঙ্কলিত 'চিঠিপত্র'।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যারা ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোক এই শ্রেণিতে পড়ে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণির পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। গুটিকতক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে, যেমন টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, ক্রোটন, জেব্রা। অনেক রকম স্থূল তথ্যও তাদের জানা থাকতে পারে, যেমন জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চাইতে আলিউমিনিয়াম হালকা, লাউ, কুমড়ো জাতীয় গাছে দুরকম ফুল হয়। এই রকম সামান্য জ্ঞান থাকলেও সুশৃঙ্খল আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিছুই জানে না। এই শ্রেণির পাঠক ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেজন্য বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়। ছেলেবেলায় আমাকে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি পড়তে হয়েছিল। 'এক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইবে'—এর মানে বুঝতে বাধা হয়নি, কারণ ভাষাগত বিরোধী সংস্কার ছিল না। কিন্তু যারা ইংরেজি জিওমেট্রি পড়েছে তাদের কাছে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি সুশ্রাব্য ঠেকবে না, তার মানেও স্পষ্ট হবে না। যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত। আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজকার্যে দেশি পরিভাষা চালাচ্ছেন, তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন, কারণ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণির পাঠক যখন বাংলায় বিজ্ঞান শেখে তখন ভাষার জন্য তার বাধা হয় না, শুধু বিষয়টি যত্ন করে বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে তাকে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠক যখন বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন তাকে পূর্ব সংস্কার দমন করে (অর্থাৎ ইংরেজির প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত বর্জন করে) প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে পাশ্চাত্য পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশি চেষ্টা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্‌যোগের এই ত্রুটি ছিল যে তাঁরা একযোগে কাজ না করে স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন, তার ফলে সংকলিত পরিভাষার সাম্য হয়নি, একই ইংরেজি সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষাসমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কয়েকজন লেখক একযোগে কাজ করেছিলেন, তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।

পরিভাষা রচনা একজনের কাজ নয়, সমবেতভাবে না করলে নানা ত্রুটি হতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন খুব বড়ো নয়, আরও শব্দের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু দরকার মতন বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক রচনা চলতে পারে। যতদিন উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচিত না হয় ততদিন ইংরেজি শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত সমিতি বিস্তর ইংরেজি শব্দ বজায় রেখেছেন। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজি নামই বাংলা বানানে চলবে, যেমন অক্সিজেন, প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজি (বা সার্বজাতিক, international) নামও বাংলায় চালানো যেতে পারে, যেমন ম্যালভাসি, ফার্ন, আরথ্রোপোডা ইনসেক্টা।

পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলেও কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন। ইওরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য এবং সাধারণে তা সহজেই বোঝে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা তেমন নয়, বয়স্কদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতন গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য কালক্রমে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে এই অসুবিধা দূর হবে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি, অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। অনেক লেখক মনে করেন, ইংরেজি শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজি sensitive শব্দ নানা অর্থে চলে, যেমন sensitive person, wound, plant, balance, photographic paper ইত্যাদি। বাংলায় অর্থভেদে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত, যেমন অভিমানী, ব্যথাপ্রবণ, উত্তেজী, সুবেদী, সুগ্রাহী। Sensitized paper-এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ অতি উৎকট, কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন। সুগ্রাহী কাগজ লিখলে ঠিক হয়।

অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজিতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage , —'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পৌঁছায়নি।' এ রকম বর্ণনা বাংলা ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু এঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয়নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction — 'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না।' এ রকম মাছিমারা নকল না করে 'নাইট্রোজেনের কোনো পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।

অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন 'অমেরুদণ্ডী'র বদলে লেখা যেতে পারে, যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু 'আলোকতরঙ্গ'র বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছু মাত্র সহজ হয় না। পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয় তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্প পরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থলবিশেষে ইংরেজি নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।

আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন — অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'দেশ'এর অর্থ ভারত ইত্যাদি, অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা'—এখানে লক্ষণীয় দেশের অর্থ দেশবাসীর। 'অরণ্য'এর আভিধানিক অর্থ বন, কিন্তু 'অরণ্যে রোদন' বললে ব্যঞ্জনার অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাধারণ সাহিত্যে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভালো। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, রূপকও স্থলবিশেষে চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জন করাই উচিত। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক—এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী এই প্রবাদটি যে কত ঠিক তার প্রমাণ আমাদের সাময়িকপত্রাদিতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি—'অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।' এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর। সম্পাদকের উচিত অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া।

রাজশেখর বসু (১৮৮০—১৯৬০) : জন্ম নদিয়া জেলার বীরনগরে। পিতা দার্শনিক পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বসু দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য রাজশেখর বসু চিরস্মরণীয়। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রভৃতি রসরচনার তিনি অনন্য স্রষ্টা। তাঁর লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ গুলির মধ্যে রয়েছে : 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের খনিজ', 'কুটির শিল্প' ইত্যাদি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি 'চলন্তিকা' বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। তিনি 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প' অনুবাদ করেন। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করেন।

অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান

জয় গোস্বামী

অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে
আমি এখন হাজার হাতে পায়ে
এগিয়ে আসি, উঠে দাঁড়াই
হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়াই
গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে

গান তো জানি একটা দুটো
আঁকড়ে ধরে সে-খড়কুটো
রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে
মাথায় কত শকুন বা চিল
আমার শুধু একটা কোকিল
গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে

অস্ত্র রাখো, অস্ত্র ফ্যালো পায়ে
বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়ে
গান দাঁড়াল ঋষিবালক
মাথায় গোঁজা ময়ূরপালক
তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান
নদীতে, দেশগাঁয়ে
অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায়ে...

জয় গোস্বামী : জন্ম ১৯৫৪, কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই ‘প্রত্নজীব’, ‘উন্মাদের পাঠক্রম’, ‘ভুতুমভগবান’, ‘ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?’, ‘বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা’, ‘পাগলী তোমার সঙ্গে’, ‘সূর্য পোড়া ছাই’, ‘হরিণের জন্য একক’, ‘ভালোটি বাসিব’, ‘হার্মাদ শিবির’, ‘গরাদ! গরাদ!’ প্রভৃতি। ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’ তাঁর স্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ‘সেই সব শেয়ালেরা’, ‘সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা’ প্রভৃতি। বাংলা কবিতার আলোচনায় তাঁর লেখা ‘আকস্মিকের খেলা’, ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’, ‘গোঁসাইবাগান (তিন খণ্ড)’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার সহ বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

নদীর বিদ্রোহ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে রওনা করাইয়া দিয়া নদেরচাঁদ নূতন সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, আমি চললাম হে!

নূতন সহকারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নদেরচাঁদ বলিল, আর বৃষ্টি হবে না, কী বলো?

নূতন সহকারী একবার জলে জলময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষণ থামিয়াছে। পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই। নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মতো ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। আকাশে যেমন মেঘ করিয়া আছে, হয়তো আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হইয়া যাইবে। তা হোক। ব্রিজের একপাশে আজ চুপচাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না। পাঁচদিনের আকাশ ভাঙা বৃষ্টি না জানি নদীকে আজ কী অপরূপ রূপ দিয়াছে? দুদিকে মাঠঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, রেলের উঁচু বাঁধ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুপাশে চাহিয়া চাহিয়া নদেরচাঁদ নদীর বর্ষণ-পুষ্ট মূর্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্য নদেরচাঁদের এত বেশি মায়া একটু অস্বাভাবিক। কেবল বয়সের জন্য নয়, ছোটো হোক, তুচ্ছ হোক, সে তো একটা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, দিবারাত্রি মেল, প্যাসেঞ্জার আর মালগাড়িগুলির তীব্রবেগে ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের সেও তো তাহাদেরই একজন, নদীর জন্য এমনভাবে পাগলা হওয়া কি তার সাজে? নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না। নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।

অস্বাভাবিক হোক, নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে। নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে, নদীর ধারে সে মানুষ হইয়াছে, চিরদিন নদীকে সে ভালোবাসিয়াছে। দেশের নদীটি তার হয়তো এই নদীর মতো এত বড়ো ছিল না, কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে, আর প্রথম যৌবনে বড়োছোটোর হিসাব কে করে? দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটি অসুস্থ দুর্বল আত্মীয়ার মতোই তার মমতা পাইয়াছিল। বড়ো হইয়া একবার অনাবৃষ্টির বছরে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারাও প্রায় শুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।

ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে সে চাঞ্চল্য দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য যেন ছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। আজ যেন সেই নদী খেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনোচ্ছ্বাসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণ নদেরচাঁদ একটি সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা নদীর কথা ভাবিতেছিল। তার চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্তিকে তাই যেন আরও বেশি ভয়ংকর, আরও বেশি অপরিচিত মনে হইল।

ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেন্টে গাঁথা ধারকস্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসিয়া সে প্রতিদিন নদীকে দেখে। আজও সে সেইখানে গিয়া বসিল। নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকস্তম্ভগুলিতে বাধা পাইয়া ফেনিল আবর্ত রচনা করিতেছে। এত উঁচুতে জল উঠিয়া আসিয়াছে যে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়। নদেরচাঁদের ভারী আমোদ বোধ হইতে লাগিল। পকেট খুঁজিয়া পুরাতন একটি চিঠি বাহির করিয়া সে স্রোতের মধ্যে ছুড়িয়া দিল। চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল চিঠিখানা! উন্মত্ততার জন্যই জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল, তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়া চিঠিখানা যেন তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

দুদিন ধরিয়া বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নদেরচাঁদ বউকে প্রাণপণে একখানা পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি পকেটেই ছিল। একটু মমতা বোধ করিল বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে খেলা করার লোভটা সে সামলাইতে পারিল না, এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে

ফেলিয়া দিতে লাগিল।

তারপর নামিল বৃষ্টি, সে কী মুষলধারায় বর্ষণ! ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম করিয়া মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে।

নদেরচাঁদ বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল, উঠিল না। নদী হইতে একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ উঠিতেছিল, তাঁর সঙ্গে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মিশিয়া হঠাৎ এমন একটা সংগত সৃষ্টি করিয়াছে যে নদেরচাঁদের মন হইতে ছেলেমানুষি আমোদ মিলাইয়া গেল, তার মনে হইতে লাগিল এই ভীষণ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের স্তিমিত আলো মিলাইয়া চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল, বৃষ্টি একবার কিছুক্ষণের জন্য একটু কমিয়া আবার প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল, ব্রিজের উপর দিয়া একটা ট্রেন চলিয়া যাওয়ার শব্দে আকস্মিক আঘাতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার মতো একটা বেদনাদায়ক চেতনা কিছুক্ষণের জন্য নদেরচাঁদকে দিশেহারা করিয়া রাখিল, তারপর সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্তনাদি জলরাশির কয়েক হাত উঁচুতে এমন নিশ্চিন্তমনে এতক্ষণ বসিয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। হোক ইট, সুরকি, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমনভাবে খেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।

অন্ধকারে অতি সাবধানে লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নদেরচাঁদ স্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিল। নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে। ব্রিজটা ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিক গতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু পারিবে কি?

পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে? আজ যে ব্রিজ আর বাঁধ সে ভাঙিয়া ফেলিবে, কাল মানুষ আবার সেই ব্রিজ আর বাঁধ গড়িয়া তুলিবে। তারপর এই গভীর প্রশস্ত, জলপূর্ণ নদীর, তার দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হইতে না জানি মোটে আর কতদিন লাগিবে?

স্টেশনের কাছে নূতন রং করা ব্রিজটির জন্য এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে। আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের?

বোধহয়, এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই পিছন হইতে ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষিয়া দিয়া চলিয়া গেল ছোটো স্টেশনটির দিকে, নদেরচাঁদ চার বছর যেখানে স্টেশনমাস্টারি করিয়াছে এবং বন্দি নদীকে ভালোবাসিয়াছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮—১৯৫৬) : জন্ম সাঁওতাল পরগনার দুমকায়। আদিনিবাস বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যরচনা করেছেন 'মানিক' নামে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে পড়ার সময় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী', 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। একুশ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনা করেন। যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫)। তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'সরীসৃপ', 'বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভেজাল', 'হলুদ পোড়া', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'পরিস্থিতি, ছোটোবড়ো', 'মাটির মাশুল', 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওলা', 'লাজুকলতা' প্রভৃতি। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' হলো তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত। 'লেখকের কথা' তাঁর লেখা প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

শিখন পরামর্শ

দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাবমূলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। পাতাবাহার, সাহিত্য মেলা ও সাহিত্য সঞ্চয়ন (নবম শ্রেণি)— অর্থাৎ তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহকে আরো প্রসারিত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। ভাবমূলের বিন্যাস, শিক্ষাবর্ষের জন্য তিনটি পর্যায়ে অনুসরণীয় পাঠ্যসূচির বিভাজন ও নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রশ্নের কাঠামো এবং নম্বরের বিভাজন নীচে দেওয়া হলো :

সাহিত্য সঞ্চয়নের ভাবমূলের বিন্যাস :

পাঠের নাম	ভাবমূল
প্রথম পাঠ	অনুভূতির জগৎ
দ্বিতীয় পাঠ	চারপাশের পৃথিবী
তৃতীয় পাঠ	ইতিহাস ও সংস্কৃতি
চতুর্থ পাঠ	সাংস্কৃতিক বহুত্ব
পঞ্চম পাঠ	স্বদেশ ও স্বাধীনতা
ষষ্ঠ পাঠ	অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য
সপ্তম পাঠ	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবতা

শিক্ষাবর্ষে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত পাঠ্যসূচি :

পর্যায়	পাঠের নাম		
প্রথম পর্যায়ক্রমিক (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০)	আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, জ্ঞানচক্ষু, আফ্রিকা, হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, অসুখী একজন,	কারক ও অকারক সম্পর্ক এবং অনুবাদ	কোনি- ১-৩০ পাতা
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০)	বহুরূপী, অভিষেক, সিরাজদ্দৌলা, প্রলয়োল্লাস, পথের দাবী	সমাস এবং প্রতিবেদন	কোনি- ৩০-৪৯ পাতা
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৯০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০)	পাঠ্যসূচির অন্তর্গত সমস্ত রচনা	ব্যাকরণের ও নির্মিতির সমস্ত অধ্যায়	কোনি- সম্পূর্ণ বই

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Very short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
কবিতা	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
প্রবন্ধ	০৩	০৩	×	০৫	১১
নাটক	×	×	×	০৪	০৪
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ	×	×	×	৫+৫=১০	১০
ব্যাকরণ	০৮	০৮	×	×	১৬
নির্মিতি	×	×	×	* প্রবন্ধ রচনা — ১০ * অনুবাদ — ০৪ সংলাপ রচনা অথবা প্রতিবেদন রচনা — ০৫	১৯

১০ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ৪০০ শব্দ
০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ১৫০ শব্দ
০৪ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ১২৫ শব্দ
০৩ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য :	কম বেশি ২০ শব্দ

MCQ-এর ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। VSA এর ক্ষেত্রে গল্পের ৫টির মধ্যে ৪টি, কবিতার ৫টির মধ্যে ৪টি, প্রবন্ধের ৪টির মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। SA এবং Essay type প্রশ্নের ক্ষেত্রে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক থেকে একটি করে বিকল্প থাকবে। পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ থেকে ৩টি Essay type প্রশ্নের মধ্যে দুটির উত্তর করতে হবে। ব্যাকরণ অংশের VSA এর ক্ষেত্রে ১০টির মধ্যে ৮টির উত্তর করতে হবে। ৪টি প্রবন্ধের মধ্যে থেকে ১টির উত্তর করতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। সংলাপ অথবা প্রতিবেদন— যে কোনো ১টির উত্তর করতে হবে।

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধ ও অনুবাদের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের আনুপাতিক মান প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে যে যে বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্গত থাকবে না তার মান প্রশ্নের অন্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব অনুসারে বণ্টিত হবে।

নতুন প্রশ্ন-কাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নের নমুনা

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-১**

১.১ 'বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয় কেউ আবার বেশ বিস্মিত।'
বাসযাত্রীদের এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ —
(ক) বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ বহুরূপী হরিদাকে ধমক দিয়েছে। (খ) বহুরূপী হরিদার পাগলের সাজটা হয়েছে চমৎকার। (গ) হরিদা আজ একজন বাউল সেজে এসেছেন। (ঘ) কাপালিক সেজে এলেও হরিদা আজ কোনো পয়সা নিলেন না।

১.২ 'দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে'— উদ্ধৃতাংশে 'মানহারা মানবী' বলতে বোঝানো হয়েছে
(ক) আফ্রিকা মহাদেশকে (খ) বসুধাকে, (গ) ভারতবর্ষকে, (ঘ) পশ্চিম দুনিয়াকে।

২. কমবেশি ২০ টি শব্দে উত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-১**

২.১ 'আমার সঙ্গে আয়'—অমৃত ইসাবকে এমন নির্দেশ দিল কেন?

২.২ 'তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান/নদীতে, দেশগাঁয়ে'—কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

৩. প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কম-বেশি ৬০টি শব্দে উত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-৩**

৩.১ 'নদীর বিদ্রোহ' গল্পে নদীর বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৩.২ 'অতি মনোহর দেশ...।'
'সিন্ধুপারে' কবিতাংশ অনুসরণে মনোহর দেশটির বর্ণনা দাও।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো (কম-বেশি ১৫০ শব্দে) **প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫**

৪.১ 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।'—
এরপর পুলিশ-স্টেশনে কী পরিস্থিতি তৈরি হলো, তা পাঠ্যাংশ অনুসরণে আলোচনা করো। ৫

৪.২ 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'।
—কাদের উদ্দেশে কবির এই আহ্বান? কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে এই আহ্বানধ্বনির পুনরাবৃত্তির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করো। ২ + ৩

৪.৩ 'আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই।'— লেখক বর্ণিত কালি তৈরির পদ্ধতিটি বুঝিয়ে দাও। ৫

৪.৪ 'অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়'।—মতটিকে তুমি কি সমর্থন করো? ৫

৫. কম-বেশি ১২৫ শব্দে উত্তর লেখো (যেকোনো একটি) : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪**

৫.১ 'বাংলার মান, বাংলার মর্যদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সবরকমে আমাকে সাহায্য করুন।'—সিরাজ কাদের কাছে এই সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন? কেন তিনি এই সাহায্যের প্রত্যাশী হয়েছেন? ১ + ৩

৫.২ 'ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত এই বাক্যজ্বালা আমি আর সইতে পারিনা লুৎফা!'— লুৎফা কে? বক্তার কথায় ঘরে-বাইরের কী ধরনের বাক্যজ্বালার প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয়েছে? ১ + ৩

সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

৮ জুলাই ২০১৬ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা পশ্চিমবঙ্গ শপথ নিয়েছে পথ সংস্কৃতি মেনে চলার। এ শপথ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার। এ শপথ সর্তক হয়ে পথ চলার। পথের নিয়ম মেনে চলার লক্ষ্যে প্রশাসন, পুলিশ, পরিবহনকর্মী, পথচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা একসূত্রে গ্রন্থিত হোক। আমরা সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালাব। আমরা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দুর্ঘটনা ডেকে আনব না। আমরা প্রতিদিন সুস্থ দেহে, নিরাপদে অপেক্ষারত প্রিয়জনদের কাছে ঘরে ফিরে আসব। এই শপথ একদিন-দু-দিন বা একটি সপ্তাহের নয় এ আমাদের আজীবনের অঙ্গীকার হোক। আসুন, আমরা সকলে মিলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত Safe Drive Save Life-এর অঙ্গীকার দৃঢ় করবার শপথ নিই। শপথটি নীচে দেওয়া হলো—

আমাদের প্রতিজ্ঞা

পথ সংস্কৃতি জানব
ট্রাফিক নিয়ম মানব
আমি সতর্ক হয়ে চলব
সুস্থভাবে এগিয়ে যাব
পথকে জয় করব
শান্ত জীবন গড়ব
পথ শুধু আমার নয়
এ পথ মোদের সবার
তা সর্বদা মনে **রাখব।**